

২০ মে ২০২৪

বঙ্গ

কালকূট ১০০



২০ মে ২০২৪

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী

রতনকুমার ভট্টাচার্য
মৃনাল পাল
বৃষ্টিধারা দাশগুপ্ত
কুহক

ছোটগল্প

রূপক বিশ্বাস

কবিতা

নজর উল ইসলাম
তন্ময় কবিরাজ
আহমদ সাইফ
দিলীপকুমার দাস
শুভদীপ দত্ত প্রামাণিক
উৎপল দাস
আরণ্যক দাস

নিয়মিত বিভাগ

আজকাল হালচাল : কান চলচ্চিত্র উৎসব
লাইমলাইট : বই খবর

লেখা পাঠানোর ইমেল: ranganmagazine@gmail.com

মূল্য: ১৪টাকা

গ্রাফিক্স: ঋচীক সরকার
সম্পাদক: অয়ন সাঁতরা

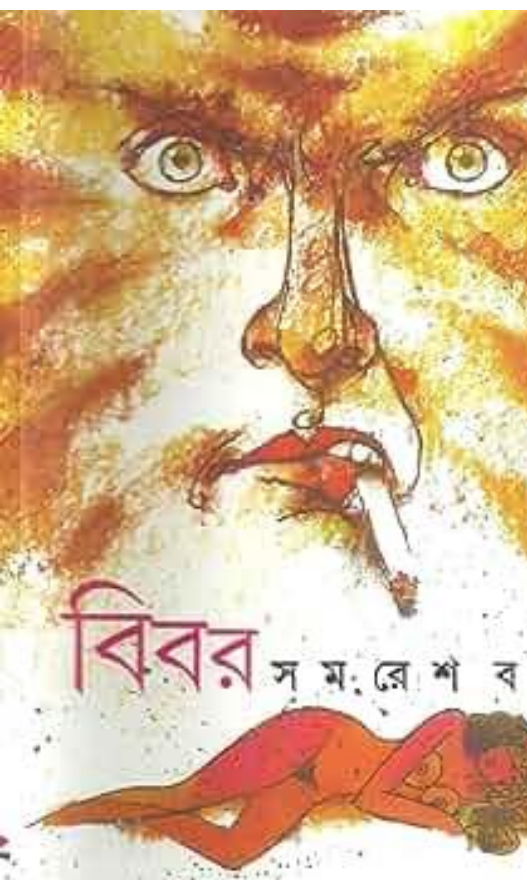
সম্পাদকীয়

সমরেশ বসু যে সময়ে বিস্ফোরণের মতো উঠে আসছেন বাংলা সাহিত্যে, সেটা বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের নতুন জোয়ারের সময়। ঠিক সিনেমায় নব্যতরঙ্গের মতো। এক্ষেত্রেও নব্যতরঙ্গের মতো ফ্রান্স থেকেই ছড়িয়ে পড়ল বিষয়টা। উত্তরবিশ্বযুদ্ধ সময়ে উদ্ভান্ত মানুষের দলিল হয়ে উঠছিল যেমন ক্রমশ থিয়েটারের নতুন ফর্ম, ছোটগল্পে যেমন মূল্যবোধের অবক্ষয় ধরা পড়ছিল উত্তরোত্তর -মানুষের ভিতরটা ডিসেকশান রুমে শব্দেদের মতো করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হচ্ছিল, সেই সময়েই ‘অবিশ্বাসের যুগে’ রব গ্রিয়ে প্রমুখ ন্যূভো রম্যা আন্দোলনের পথিকৃতরা নতুন উপন্যাসের সপক্ষে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যেও এই সময়ে উপন্যাসের ফর্ম থেকে শুরু করে রচনার বিষয় ও লিখন কৌশলে যিনি আপামর পাঠককে শুধু চমক নয়, বিশুদ্ধবাদীদের অস্বস্তিতে ফেলে দিতে পারলেন তিনিই কালকূট। কালকূট ছদ্মনামে প্রকাশিত লেখাগুলিতে অবশ্য তিনি অনেক বেশি ‘অভসার্ভার’, তুলনায় পরবর্তীতে তিনি যেসব উপন্যাসে হাত দেবেন সেখানে তিনি গবেষক। মানব মনের চোরাকুঠুরির গবেষক। সমাজকে সমাজের পরিণে দেওয়া চশমার বাইরে নিয়ে এসে ফেলার কারিগর!

যদিও সমরেশ বসুর জন্মমাস ডিসেম্বরে, তাও এই সংখ্যাতেই আমরা সমরেশ বসুর শতবর্ষ উদযাপন করছি। প্রচ্ছদ কাহিনীতে বিভিন্ন লেখকরা সমরেশ বসুর সাহিত্য ও জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকের কলমে আরো একবার এই কালজয়ী সাহিত্যিককে স্মরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি রঙ্গনের অন্যান্য সংখ্যার মতো এই সংখ্যাতেও থাকছে গল্প, কবিতা ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ।

ধন্যবাদ,

২০ মে, ২০২৪



সমরেশ বসু

বিবরঃ সভ্যতার সংকট ও
ব্ল্যাকহোল

কুহক

সমরেশ বসু যে সময় বিবর
লিখেছেন, সেই সময়টা সারা
বিশ্ব জুড়ে সাহিত্যে একটা
নতুন ভাঙাচোরার সময়; এই নিয়ে দ্বিমত
নেই। ভার্জিনিয়া উলফ ১৯২৫ সালে
(অর্থাৎ সমরেশ বসু তখন এক বছর
কাটিয়েছেন মাত্র এই ধরাধামে) একটি
বক্তৃতায় বললেন, ১৯১০ সালের পর থেকে
গল্প-উপন্যাসের চরিত্র (গঠন, বিন্যাস ও
বিষয়বস্তুর ‘এক্সপ্লোর’ সম্পর্কেই
বলেছিলেন) বদলে যেতে শুরু করেছে।
নির্দিষ্টভাবে ১৯১০ সালকেই বেছে নেওয়ার
কারণ ওই বছর মার্কিনমূল্যে পোস্ট
এক্সপ্রেসশানিস্ট শিল্পীদের আঁকা ছবির এক
বিখ্যাত প্রদর্শনী হয়েছিল। সেইসব ছবির যা
ভাবনা ও সেইসব ভাবনার প্রকাশ করার যে
ভঙ্গি, গদ্য সাহিত্যেও মোটামুটি ওই একই
সময় থেকে, একইভাবে বিষয়বস্তুকে
এক্সপ্লোর করার ভঙ্গির খোলনলচে সব
বদলে যেতে শুরু করে। এবার ১৯১০
সালের চিত্রপ্রদর্শনীকে উলফ একটা ফলক
হিসেবে ধরেছিলেন আলোচনার সুবিধার্থে,
কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতেই
ছড়মুড় করে মেদিনী কাঁপানো যেসব কাজ
হয়ে গিয়েছিল (ফ্রয়েড তাঁর স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে
আসছেন, আবার আইনস্টাইন নিয়ে
আসছেন রিলেটিভিটি থিওরি) তার প্রভাব
সাহিত্যেও এসে পড়বে সেটা খুবই
স্বাভাবিক। ঠিক একইভাবে দেখতে গেলে,
উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইন ‘অরিজিন অফ
স্পিসিস’ লিখে যেভাবে মানুষের
এতদিনকার বিশ্বাস ও চিন্তায় একটা ধাক্কা
দিলেন, একইসাথে প্রভাব ফেললেন
সাহিত্যেও (প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত না হলেও,

একজন সত্যিকারের শিল্পীর শিল্পচেতনায়
নতুন ব্যাখ্যাত ‘থিওরি’ এক নতুন দর্শন
চিন্তার উন্মেষ ঘটাবেই), তেমনই বিংশ
শতাব্দীর গোড়াতে ফ্রয়েড, আইনস্টাইন,
বলশেভিক বিপ্লবের রাজনৈতিক চিন্তার
প্রভাব, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, চলচ্চিত্রের হামাগুড়ি
পর্ব এমনকই মায় টেলিভিশন পর্যন্ত
উপন্যাসিকের কলমকে যেভাবে প্রভাবিত
করল এবং সাহিত্যিক তাঁর ব্যক্তিগত
দার্শনিক জিজ্ঞাসার যেভাবে বহিঃপ্রকাশ
করতে শুরু করলেন, তাতে সাহিত্যের
জগতে একটা ঝড় এল। দ্বিতীয়বার এই ঝড়
এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। যে ঝড়ের
মধ্যে আমাদের বাংলা সাহিত্যে যারা মাথা
তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সমরেশ বসুকে
পুরোধা বললে অতুক্তি হয় না, অন্তত ওঁর
উপন্যাস রচনার স্পর্ধার দিকে তাকিয়ে।
বেকেট যে অ্যাবসার্ড নাটকের জন্ম
দিয়েছিলেন, তা কিন্তু
দ্বিতীয়বিশ্বযুদ্ধান্তরকালে অধিক ‘পপুলার’
হল, কারণ এই সময় থেকেই মানুষ প্রকৃত
অর্থে ‘আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে’ ভুগতে শুরু
করে। এর আগে এহেন অস্থিরতা ব্যক্ত
করতে লেখকরা পরাবাস্তবতার কাছে
আশ্রয় নিয়েছে, এসেছে ‘সাররিয়ালিজম’,
উপন্যাসে খুলে গেছে নতুন প্রকরণ
‘চেতনাপ্রবাহরীতি’। ‘মনস্তত্ত্ব’ বিষয়টা
উপন্যাসের কেন্দ্রে এর আগে এলেও
প্ল্যাকার্ড হাতে উঠে এল বিংশ শতকের
প্রথম ভাগেই। আর ঠিক এভাবেই অস্থিরতা,
মূল্যবোধ, ক্রাইসিস আর বিরাট প্রশ্চিহ্ন
নিয়ে পাঁচের দশকে ফ্রান্সে এল ‘নিউ
নভেল’। রব গ্রিয়ে, রুদ্র সিমরা এগিয়ে
এলেন ‘নতুন উপন্যাসের সপক্ষে’। খেয়াল

করলে দেখা যাবে এটা কিন্তু সেই সময়, যে
সময় অ্যালান টিউরিং প্রশ্ন তুললেন এবং
বোধহয় প্রথম সর্বসমক্ষে প্রশ্নটা ছুঁড়ে
দিলেন, ‘ক্যান মেশিন থিঙ্ক?’ পাঁচের দশকই
তো ‘আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ এর
জন্মকাল। অর্থাৎ যে বিশ্বযুদ্ধান্তরকালে
মানুষের মূল্যবোধ, চিন্তা করার ধরন, ‘কী
হচ্ছে’ এবং ‘আমি কী ও কোথায়’ এর
মতো দার্শনিক, জীবন জিজ্ঞাসার প্রশ্ন
নিতানৈমিত্তিক বাঁচার সঙ্গে ‘প্র্যাক্টিকালি’
জড়িয়ে যাচ্ছে, সেই ‘সভ্যতার’ ক্রমবিবর্তনে
ঠিক এক শতাব্দী পরে যা (এ.আই) জায়গা
করে নিতে চলেছে এইসব প্রশ্নগুলিকেই
আরো গু বলেট করে দিয়ে, অর্থাৎ
চিন্তাচেতনার ট্রান্সিশানেও সময় না দিয়ে যা
কেবল চোখের সামনে ধাঁধা দেখাবে তার
জন্মক্ষণের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে শুরু
হয়েছিল সাহিত্যের নতুন ঢেউ, সাহিত্যে
সমাজ চেতনা নয় শুধু আর, সাহিত্য
‘ইন্টেলেকুয়াল’ একটা চরিত্র হয়ে এগিয়ে এল।
আর বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু জেনে বা
না জেনে তার শরিক হলেন এই ‘বিবর’
উপন্যাসের মধ্য দিয়েই।
ফ্রান্সের ‘ন্যুভো রমা’ পর্বের যে
উপন্যাসগুলিকে নিউ নভেল বলে চিহ্নিত
করা যায়, বিবর ঠিক সেইরকম ‘নভেল’ নয়
অবশ্যই, কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ধারায়
রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইরে’ যেরকম একটা
পরিবর্তন এনেছিল, একটা মোড় ঘুরিয়ে
দিয়েছিল, সমরেশ বসুও বিবর উপন্যাসটি
লিখে বাংলা উপন্যাসে আবার একটা ধাক্কা
দিলেন। আর ধাক্কাটা বাংলা সাহিত্য এক
ঝটকায় সামলে উঠতে পারল না, এবং
পারল না বলেই বিবর লেখার সময়কালটার

দিকে তাকানোটা এতটা জরুরী, সেই সময়ে
বিশ্বসাহিত্যে উপন্যাসের পালাবদল
দেখাটাও এতটা জরুরী। নিউ নভেলের
মতো উপন্যাসের স্কেলটনকে যে একেবারে
উপড়ে ফেলে দিলেন সমরেশ বসু তা তো
নয়, তাহলে বিবরের হাত ধরে কী এমন
উঠে এল যাতে করে বাংলা উপন্যাস একটা
ঘা খেল!

এইখানে আমাদের উপন্যাসে ঢুকে
পড়তে হবে। বিবর শুরু হচ্ছে একেবারে
গোড়া থেকে। বইয়ে কোনও উৎসর্গ নেই,
বা হয়তো ওই লাইনটিই উৎসর্গ, অথবা
একটা ভূমিকামাত্র — ‘আচ্ছা, আমরা যদি
সবাই, সত্যি কথা বলতে পারতাম...’

‘মানবতা’ বা ‘মূল্যবোধের’ কোনও
নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হয় কিনা জানা না থাকলেও
এই একটা মাত্র লাইন থেকেই কিন্তু বোঝা
যায় লেখক ঠিক কোন সামাজিক ব্যক্তি (?)
কে চিহ্নিত করতে কলম ধরছেন।

উপন্যাস শুরু হওয়া মাত্রই পাঠক গিয়ে
ঢুকে পড়ে একেবারে উপন্যাসের মাঝখানে,
কোনওরকম কোনও ভূমিকা ছাড়াই। আর
কয়েকটা পরিচ্ছেদ পড়ার পরেই পাঠক
একটা অস্বস্তিও অনুভব করতে শুরু করবেন
(স্বাভাবিকভাবেই), যে অস্বস্তিটা আসলে
লেখক তাঁর মুনশিয়ানায় তৈরিই করতে
চেয়েছেন। আমরা ঠিক কোথায় বাস করছি,
সময়ের প্রভাব এবং প্রভাবিত সময়ের ফসল
হিসেবে আমরা, অর্থাৎ যে মনুষ্যজাতি
পৃথিবীতে চরে বেরাচ্ছি, সেই আমাদেরই
‘ক্রাইসিস’কে ‘পয়েন্ট আউট’ করছেন
লেখক আসলে, তাও আবার আমাদেরই
মনের একেবারে ভিতরে ঢুকে গিয়ে। আর
মনের একেবারে ভিতরে ঢুকে গিয়ে

সামাজিকভাবে ঘোষিত শ্লীলতাকে চ্যালেঞ্জ
জানিয়েছেন বলেই (যেটা সমরেশ বসু তাঁর
আরো বহু লেখাতেই করেছেন) এখানে
অস্বস্তিটা আরো জমাট বাঁধে। যে নায়কের
স্বগোতক্তিগুলি ঘৃণ্য বলে মনে হয়, উপন্যাস
এগোনোর সাথে সাথে বোঝা যায় এই
অশ্লীল স্বগোতক্তিগুলি আদর্শে আমাদের
সমাজের আত্মসমীক্ষা। আমাদের নৈমিত্তিক
যাপনের আড়ালে থাকা ভীষণ বাস্তব
ছবিটার কথন।

উপন্যাসের আখ্যানভাগে উপস্থিত স্থান
এবং ঘটনাবলী, এই পুরোটাই একটা সময়ের
পর থেকে মনে হতে শুরু করে যেন
‘সিম্বল’। যদিও এর ঘটনার বর্ণনা এবং সিন
বাই সিন ঘটে চলা ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিই
একটা বাস্তব গল্পই বলে। তাও পাঠকের
মনে হবে নীতার খুনটাও আসলে একটা
রূপক!

হ্যাঁ, রূপকই তো। এই মহাবিশ্বে
ব্ল্যাকহোলের অতল আর সমরেশ বসুর
চিহ্নিত করা বিবরের অতল যেন একই। তাই
নীতার খুনের মধ্য দিয়ে কাহিনির কথকের
আত্মসমীক্ষণ তথা এই গোটা সমাজের,
সময়ের আত্মসমীক্ষণের কথক এই উপন্যাস।
আমরা যে ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের যুগের
বাসিন্দা এবং মনের গভীরে ডুব দেওয়ার
চেষ্টা করলে আদি অনন্তকাল ধরে আমাদের
মনে আসলে ফ্রয়েড আবিষ্কৃত ‘বিটার ট্রুথ’ই
সামনে উঠে আসবে সেটাও লুকোচুরি না
করেই দেখান লেখক। তাই একটা জায়গায়
গিয়ে মনেই হয় কথক, কথকের অফিস,
নীতা বা এই খুনের তদন্ত, সবই আসলে
রূপক ও সংকেতে মোড়া কোনও ‘রিডল’।

‘আমি খুন করতে চাইনি, (মাইরি) কারণ
ওকে যদি খুন করতে হয়, তা হলে তো
আমার নিজেকেও খুন করতে হয়’ — নীতার
খুন সম্পর্কে কথকের উপলোদ্ধি। এই
বোধটাই কিন্তু উপন্যাসের শেষ অবধি তাড়া
করে নিয়ে গেছে শুধু কথকেই নয়,
পাঠককেও।

আসলে মূল্যবোধ, মানবতা ও
সামাজিকতার ভরণ; সব কিছুকেই এক
লাইনে এনে মনের কাটাছেঁড়াই শুধু নয়,
‘তুমি আসলে এটাই ভাবো, এটাই চাও,
আর ঠিক এই জায়গায় তোমার অবস্থান’ —
এটা যখন এতটা খোলামেলাভাবে লেখক
দেখিয়ে দেন তখনই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক।
মানব সভ্যতার ইতিহাস আসলে বাজারের
ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসে মানুষের
অস্তিত্বে ‘প্রেম’ (উপন্যাসে ব্যঙ্গ করে
বারবার পেরেম বলা হয়েছে) নামক
অতিরিক্ত বস্তুটি ঠিক কী, ডারুইনের
অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং ফ্রয়েডের
মনসমীক্ষার মধ্যে তার উপস্থিতি ঠিক
কোথায় তার অনুসন্ধানও লেখক করেছেন,
তবে সবটাই পৃথিবীর বিবরে তলিয়ে
যাওয়ার উপরে আলোকপাত করতে
করতে।

একুশ শতকে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের
সময়ে সব থেকে বড় টপিক ‘এ.আই.’ এর
কারণে সৃষ্ট একটি শব্দ ‘ডিপ ফেক’ ;
সমরেশ বসুর ‘বিবর’ আসলে এই ডিপ
ফেককেই চিহ্নিত করেন এবং স্পষ্টতই
বলেন এই ‘ফেক’ এর স্রষ্টা আমরাই, তাই
এর সব দায়ভারও আমাদেরই। এই দায়ভার
নিতে ভয় বলেই কি বিবরকে কাঠগোরায়ে
উঠতে হয়েছিল?

কা ল কু ট

মানব মনের এক বুড়ুসু পরিভ্রমণ

রতনকুমার ভট্টাচার্য

কুলাচরীর মতে আগমোক্ত পতি শিবস্বরূপ,তিনিই
গুরু বিবাহিত পতি,পতি না।কূলপূজায় স্বামী ত্যাগ
করলেও নারীর দোষ নেই।এই কূলনারী সাক্ষাৎ
কালীস্বরূপা।

এই কথা শেষ করেই সহসা অবধূত ডাক
দেয়,‘মহামায়া’।

যোগোমতী উত্তর দেয়, ‘বলো’।

‘ষট্চক্র বিষয়ে কথা বইলব তোমার সাথে’।

‘বলো’।

মুহূর্তেই যেন পরিবেশ বদলায়। দুজনেই,দুজনের
মুখোমুখি হয়ে বসে।যোগোর কোলের ওপর দুই
হাত জড়ো করা। ব্রহ্মানন্দর দুই হাঁটুর ওপরে দুই
হাত।সে জিজ্ঞেস করে, ‘মা, মেরুদন্ডের দুই পাশে
কি আছে?’

‘ইড়া পিঙ্গলা নাড়ি’।

‘তার ডাইনে বাঁয়ে?’

‘সুষুম্না মগজ পর্যন্ত’।

‘সুষুম্নার মধ্যে আর কোন্ নাড়ি আছে?’

‘ব্রজাখ্যা’।

‘ব্রজাখ্যার মধ্যে?’

‘চিত্রিণী’।

‘সুষুম্না নাড়িতে আর কি আছে মা?’

‘সাত পদ্ম বাবা।

‘কী কী?’

‘আধার, স্বাধীষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আঞ্জা,
সহস্রদল’।

অবাক হয়ে শুনতে থাকি।যেন এক ঘোর লাগা
চোখে,দু’জনের দিকে চেয়ে থাকি।বুঝি না কিছুই।

ষট্চক্র কি, দেহের মধ্যে,এত বিচিত্র জটিল যন্ত্রই বা
কি,কিছুই জানিনা।তবু আমার সামনে এক আশ্চর্য
দৃশ্য।বিচিত্র সংলাপ শুনি অবোধ

কৌতুহলে।সর্বোপরি পরমবিস্ময় লাগে বাঙলা
দেশের কোনো এক পাড়াগাঁয়ের,একটি তাঁতী
বউয়ের মুখে এসব কথা শুনে।এ যোগোমতীকে
এখন যেন আর চিনতে পারি না।তার গলার স্বর
ভিন্ন।সে যেন অন্য জগত থেকে কথা বলে।দৃষ্টি
স্থির,ধ্যানমগ্ন,এক ধরনের সমাধিস্থ ভাব যেন।
সিঁদুরের রক্তটিপসহ,এখন সে যেন ত্রিনয়নী
দেবীপ্রতিমা।আমাদের কারুর প্রতিই তাদের লক্ষ্য
নেই।

ব্রহ্মানন্দ আবার জিজ্ঞেস করে,আধার পদ্মে কয়টা
দল আছে?’

যোগোমতী বলে,‘চাইরটে।চাইর দল,চাইর

বর্ণ,বং,শং,যং,সং।ই পদ্মে চৌকোনা ধরাচক্র

আছে,উয়ার আটদিকে আট শূল।মধ্যখানেতে

জগতবীজ লং রইয়েছে,আর কর্ণিকার মধ্যে ত্রিকোণ

যন্ত্র।ই পদ্মে মধ্যে মহাদেব রইয়েছেন লিপ্সের রূপ

ধরে ওঁনার অমৃত গইলবার জায়গায় সাপিনীরূপ

কুন্ডলিনী শক্তি রইয়েছেন’।

‘জয় মা ধুমাবতী।স্বাধীষ্ঠান পদ্মের কথা শুনাও মা’।

স্বাধীষ্ঠান থাকে লিপ্সের মূলে।উহার ছয় দল,ছয়

বর্ণ,বং,ভং,মং,যং,রং,লং।ই পদ্মের মাঝখানটোতে

গোল বরুণ মন্ডল,তার মধ্যে যো অদ্ধচন্দ্র রইয়েছে,

তাতে বং বর্ণ আছে।ই পদ্মে বারুণী শক্তি থাকেন।

যোগমতীর গলায় যেন একটা আচ্ছন্নতা নেমে

আসতে থাকে,সেই সঙ্গেই উচ্চারণের মধ্যে স্পষ্টতা

লক্ষ্যনীয়।ব্রহ্মানন্দ যতই শোনে,ততই যেন সে কি

এক আবেগে আপ্ত হতে থাকে।গোপীদাসও

ইতিমধ্যে একাবারে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে।সে

হাতজোড় করে যেন পূজার বসেছে।

অবধূত বলে ওঠে ‘জয় মহামায়া।মণিপুরের কথা
বলো।’

মণিপুর নাইকুন্ডলের মূলে।উহার দশ

দল,দশবর্ণ,ডং,ঢং,গং,তং,থং,দং,ধং,নং,পং,ফং।ই

পদ্মের মাঝখানটোতে ত্রিকোণা অগ্নিমন্ডল,উয়ার

তিনদিকে তিন দিক্যে তিনটো স্বস্তীকার ভূপুর।তার

মধ্যে বং বর্ণ রইয়াছে।ই পদ্মে লাকিনী শক্তি বাস

করেন।’

‘আর অনাহত?’

‘হিদে ইয়ার খান।বার দল, বার বর্ণ কং, খং, গং, ঘং,

ঙং চং, ছং, জং, ঝং, ঞং, টং, ঠং।ই পদ্মের ছয়কোণা

বায়ুমন্ডল, উয়ার ভিতর যং বীজ রইয়েছে।ই পদ্মে

শিব আর কাকিনী শক্তি থাকেন’।(কোথায় পাবো

তারে—কালকূট)

‘কিন্তু না আমি ওটাকে সত্যি মারতে চাই নি।ধরতে

চেয়েছিলাম।ধরতে গিয়ে মারলাম—মারলাম মানে,

নিজেই মরলো।এত ফরফর করার কি ছিল, ছেউটি

ছুঁড়ির মত।যেন গায়ে হাত দিতে গেলেই সুড়সুড়ি

লেগে যায়, কাতুকুতু লাগে, আর ঐকৈবৈকে

ছটফটিয়ে মরে।তখন কোথায় লাগতে কোথায়

লাগে পাঁজরায় না বুকে।তারপরে নাও,‘উহু

সুখেনদা, নিশ্বাস ফেলতে পারছি না, কিরকম

লাগিয়ে দিলে’।

স্মা যন্তো ঝামেলা।সেই যেমন হল

একবার,পিকনিকে যাওয়া হল এখানকারই একটা

কারখানা স্টাফের সঙ্গে।

....স্মালা,এখন হাসি পায়,রাম খিস্তি করতে ইচ্ছে

করে।তার ওপরে আবার যখন দেখি ওদের

বউয়েরাও ওরকম বলে।তোদের কত্তারা বলে তার

না হয় কারণ আছে।তোরা কেন

বলিস।কুটকুটানি,না?সত্যি মেয়েলোক বলতে ইচ্ছে

হয় না,মাগী বলতে ইচ্ছে করে।আর মনে হয়

মাগীগুলোর কত্নিনকালে গা ঘামে না,গায়ে পোকা।

খাওয়া আছে,খাটুনি নেই।নরম,নরম বিছানায়
থলথলিয়ে চিত্তের দিয়ে পড়ে থাকা।(‘প্রজাপতি-
সমরেশ বসু)

উপরোক্তোক্ত উপন্যাসদ্বয়ের অংশগুলি পাঠ
করলে সহজেই মনোযোগী পাঠকের অনুধাবন
করতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে এ দুটি সম্পূর্ণ
ভিন্ন গোত্রের লেখা। কাহিনীর পটভূমিকা,তার
প্রকাশভঙ্গী,শব্দ-চয়নের মৌলিক পার্থক্য দেখে মনে
হতেই পারে দুই লেখকের অবস্থান সম্পূর্ণ বিপরীত
মেরুতে এবং এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং ভিন্ন-
মানসিকতার লেখক যে এক ব্যক্তি হতে পারে
এমনটা বহুজনের কল্পনাতীত এক
ব্যাপার।বস্তুত,উপরোক্ত উপন্যাসদ্বয় সমসাময়িক
শুধু নয়,সম্ভবতঃ ‘কোথায় পাবো তারে’ যখন
‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের হচ্ছিল তখন
দেশের শারদীয়া সংখ্যায় ‘প্রজাপতির’ প্রকাশ।যারা
‘দেশ’ পত্রিকায় কালকূটের লেখাটি পড়ে মুগ্ধ
হচ্ছিলেন এবং লেখকের প্রতিভা সম্বন্ধে পঞ্চমুখ
ছিলেন তাদের অনেকের কাছেই কালকূট এবং
সমরেশ বসু যে একই ব্যক্তি এবং এই দুই বিপরীত
মানসিকতার লেখা দুটি উপন্যাস একই ব্যক্তির
মস্তিষ্কপ্রসূত এটা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর
ছিলো।এ প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদক নিজেই
সাক্ষী।গ্রামের বাড়িতে থাকা তার এক দাদা যে
‘কোথায় পাবো তারে’ পড়ে ছিল বিমোহিত এবং
লেখকের প্রতি সম্মোহিত, কালকূট যে সমরেশ
বসুর ছদ্মনাম সেটা তার অজ্ঞাত ছিল এবং এক
আলোচনার আসরে সে তুমুল তর্কের বন্যা
বইয়েছিল এই নির্মম সত্যটা মানতে অপারগ
হয়ে।আর গ্রামনিবাসী আমার দাদার কথাই
কেন,আনন্দবাজার পত্রিকার কর্ণধার কানাইলাল
সরকার মহাশয়ও প্রজাপতি ও সেই সময়ে ইত্যাকার
লেখার বিষয়বস্তু অপছন্দ করেছিলেন এবং এই
ভেবে আশ্চর্য হচ্ছিলেন যে যে লেখক ‘কোথায়
পাবো তারে’ লিখতে পারেন কিভাবে তাঁর পক্ষে

‘প্রজাপতি’ লেখা সম্ভব! এবং এইখানেই সমরেশ
বসুর বিশেষত্ব। ‘অমৃতকুস্তুর সন্ধান’ লেখার পর
কালকূট তথা সমরেশ বসুর তখন সাহিত্যঙ্গনে
যথেষ্ট পরিচিতি, বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী
লেখক হিসাবে সাধারণ্যে এবং বিদ্যতমহলে
পরিগণিত। এই উপন্যাসের পরে লক্ষ্মীদেবীর
কিষ্ণিত কৃপায় তাঁর এ যাবৎ আর্থিকভাবে অবিন্যস্ত
বা কিয়দাংশে বেসামাল ব্যক্তিজীবনে কিছুটা
সুস্থিতির আবহাওয়া। কিন্তু সুনিশ্চিত, মধ্যবিত্ত
গতানুগতিক জীবনের আপাত-নিরাপত্তার
ঘেরাটোপে বন্দী থাকার মানুষ সমরেশ কখনই
ছিলেন না। কি ব্যক্তিজীবনে,কি লেখাজীবনে তাই
তাঁর চলার পথ কখনই একমাত্রিক তথাকথিত
নীতিনিষ্ঠিতে বন্দী থাকেনি, স্বভাবগতভাবেই তাঁর
চির- বিদ্রোহী মন ছিল করতে চেয়েছে সব
গতানুগতিকতার নাগপাশ,বরণ করতে চেয়েছে যা
আপাতবন্ধুর,কর্দমাজ,পিচ্ছিল।এর জন্য জীবনে
অনেক মূল্য দিতে হয়েছে—কুৎসা,নিন্দা,কুটিলতার
আবর্তে নিমজ্জিত হতে হয়েছে, সমাজসংসারের
এক জটিল ও কুটিল টানাপোড়েনে বিক্ষিপ্ত ও বিদ্ধ
হয়ে রক্তাক্ত হয়েছেন তবু তিনি মানুষে বিশ্বাস
হারান নি,আর নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে আপোষ
করেননি।ষাটের দশকে তাঁর লেখায় যে
আত্মজৈবনিক বাঁকবদল—
‘বিবর’,‘প্রজাপতি’,‘পাতক’ ইত্যাকার বিভিন্ন
উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজের মূল্যবোধের
অন্তর্জলীয়াত্রা,তার ঔপনিবেশিক মানসিকতা,তার
লোভ,দ্বন্দ্ব আর আত্মপ্রবঞ্চনার আবিলতার প্রেক্ষিতে
ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বিকতা,তার অন্তর্নিহিত
টানাপোড়েন,তার অসাহায্যতা,ক্রোধ আর
আত্মত্যাগের জলছবি শব্দবন্ধের যে অনুপম সৃষ্টিতে
তিনি নিবদ্ধ করেছেন তাতে হয়তো তাৎক্ষণিক
অঙ্গীলতার হা-হা রব উঠেছে, কিন্তু তিনি ক্ষণিকের
জন্যও বিশ্বাসচ্যুত হননি বরং ষাটের দশকের
রাজনৈতিক ও সামাজিক যুগকাঠে

তাড়িত,অবক্ষয়িত মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি যে
কোন সুললিত,চারুশীলিত ভাষার প্রয়োগে সম্ভব নয়
এটাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছেন। এ প্রসঙ্গে
লেখকের নিজস্ব মতামত হোল—

“সমস্ত ষাটের দশক জুড়েই এই Self
Identification এর লেখা লিখতে গিয়ে প্রবল
বিতর্ক ও আলোড়নের সৃষ্টি
হয়েছিল।‘বিবর’ও‘প্রজাপতি’ উপন্যাস নিয়ে
আমার বিরুদ্ধে অঙ্গীলতার অভিযোগ আনা
হয়েছিল। আসলে আমি যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ,
সেই মধ্যবিত্তের ঔপনিবেশিক মানসিকতা ও
চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছিল আমার লক্ষ্য।তুলে
ধরেছিলাম আমার ও চারপাশের জীবনধারণ,ভাবনা
চিন্তা ও সমাজের চিত্র।জীবনের নানা অন্ধকার ও
বিকৃতির মধ্যে,আমি সত্যকে সন্ধান
করেছি।জীবনযাপনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন,পুরনো
মূল্যবোধ তাতে আঘাত লেগেছে।কেউ কেউ
সহজে তা গ্রহণ করতে পারেনি। এমন কি লেখনীর
প্রচলিত ভাষার এক আমূল পরিবর্তনের চেষ্টাকেও
অনেকে ধিক্কার দিয়েছেন।.....কিন্তু লেখকের
তাতে কিছু আসে যায় না,সে আবার নতুন পথে
জীবনচর্চার বাঁকে চলে যায়।অর্থাৎ লেখার ভাঙাগড়া
চলতেই থাকে।“

আসলে, এই ভাঙাগড়াই মূল উপজীব্য। এ
ভাঙাগড়া না চললে নদী পরিণত হয় বন্ধ জলাশয়ে,
হয়ে যায় গতিহারা। আর ভাঙাগড়ার তাগিদেই
‘উত্তরঙ্গ’,‘বি টি রোডের ধারে’,‘শ্রীমতি কাফে’ ও
বেশকিছু কালজয়ী ছোটগল্প লেখার পরেও তাঁর মন
উদ্বাঙ্গ, মনকন্দরে কেবলই অনুপ্রাণিত হচ্ছে ‘হেথা
নয়, হেথা নয়,অন্য কোথা,অন্য কোনখানে।’
‘উত্তরঙ্গ’,‘বি টি রোডের ধারে’ এইসব উপন্যাসে
তিনি জীবনযুদ্ধে ধ্বস্ত,বঞ্চিত,অবহেলিত,পাপী অথচ
অসহায়,ক্ষুদ্র স্বার্থে বন্দী কাঁধ-ঝুঁকে-যাওয়া মানুষের
জীবনযাপনের, হাসিকান্নার, সফলতা,ব্যর্থতার ছবি
এঁকেছেন কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর মনে হচ্ছিল কোন

এক সন্ধীর্ণতার ঘেরাটোপে তাঁর সাহিত্য আবদ্ধ হয়ে পড়েছে,মন আনচান করছে এক বৃহত্তর জনপ্রাপ্তনে নিজেকে সমর্পণ করায়, সুদূর- বিস্তৃত আরো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নিজেকে ঋদ্ধ করার।এই দুর্মর আকুতি থেকেই শেষবেশে তাঁর কুস্ত্র মেলায়,প্রয়াগসঙ্গমে যাত্রা ১৯৫৪ সালে। এবং ‘কালকূট’ ছদ্মনামে ‘অমৃতকুস্ত্রের সন্ধানে’ নামক ধ্রুপদী উপন্যাসের সৃষ্টি।

এবং যেহেতু আমরা কালকূট ছদ্মনামের আড়ালে এর পর তাঁর একের পর এক কালজয়ী সৃষ্টির সম্মুখীন হয়েছি,অনেকেই স্বনামে রচিত রচনা সম্ভারের সঙ্গে কালকূট নামে রচিত রচনার তুলনামূলক বিচার করে লেখককে চিনতে চেয়েছেন।আমরা এর আগে এই দুই নামের আড়ালে দুই বিপরীত ধর্মী লেখা এবং দুই ধরণের লেখা একই লেখকের কিনা এই নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হতে দেখেছি।আসলে সমরেশ নামাঙ্কিত রচনায় যেখানে সমাজ বিশ্লেষণ,চরিত্রের জীবনসংগ্রামের যন্ত্রণা,কালকূট সেখানেই অন্তর্মুখীন পরিচয়ের সন্ধানে যাত্রা করেন।দুটি ভিন্ন পরিসরে লেখকের পৃথক যাত্রা জগৎ ও জীবনকে জানার সঙ্গে সঙ্গে চলে নিজেকে জানার প্রচেষ্টা। আত্মনামে লেখায় লেখক জীবন-পর্যবেক্ষক নাগরিক,ভোগবাদী জীবনের সমালোচক;ছদ্মনামের লেখায় তিনি যেন বাউলের মতো মনের মানুষ সন্ধানী,মানুষের অন্তর্জীবনের উন্মোচনের এক নিপুণ ভাষ্যকার।এইভাবেই কালকূট ও সমরেশের স্পষ্ট একটা পার্থক্য প্রতীয়মান হতে থাকে। সমরেশের নিজের কথাতেই—“বিপন্ন মানুষই আমার নীরিক্ষার বিষয়।”

এই বিপন্নতা যখন বহিরঙ্গে, জীবনযাপনের পাথুরে জমিতে উদ্ভূত, তখন সেই বিপন্নতার উদ্ভাস ‘সমরেশ বসুর’ কলমে। আর যখন সেই বিপন্নতার অনুরণন মানুষের অন্তর্লোকে, তার মরমীয়া আর্তগাথা প্রোথিত হয় ‘কালকূট’র কলমে।এই দুই

নামের লেখকীয় ভঙ্গির তুলনা টানতে গিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন-

“কালকূটের মন সরল, চোখ সরলহীন, সে অভিযাত্রী, সহজ এক জীবনধর্ম নিয়ে তার কারবার।সমরেশ অনেক বেশী জটিল, গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে তার সর্পিলা পথ”।

কালকূট নামের আড়ালে সমরেশ বসু প্রথমদিকে যে বাস্তব জগতের ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন,পরের দিকে মূলতঃ ১৯৭৭ পরবর্তী কালকূট লিখিত ভ্রমণকাহিনীর এক মূলগত পার্থক্য আছে।এই সময়ের ভ্রমণকাহিনীগুলি অনেকটাই মানসভ্রমণ যার সূচনা হয়েছিল ‘শাস্ত্র’ থেকে।‘শাস্ত্রের’ পরে ‘পৃথা’,‘প্রাচ্যেতস’,‘অন্তিম প্রণয়’ প্রভৃতি গ্রন্থে এই মানসভ্রমণের স্বাক্ষর আমরা পাই।

সমরেশ বসুর সুদীর্ঘ চার দশকের সাহিত্য চর্চার প্রতি পরতে পরতে যেন লুকিয়ে আছে এক বজ্রনির্ঘোষ যে আমার সাহিত্য সৃষ্টি শুধু নিছক আনন্দবর্ধনের জন্য নয়,আমার সাহিত্য কিছু বার্তাবাহী, সাহিত্যের আঙ্গিকে আমি আমার মতো করে কিছু বলতে চাই। আর সেই অভীষ্ট যাত্রায় বিস্তর ঝুঁকি নিয়েছেন, বিতর্কিত হয়েছেন,সমালোচিতও হয়েছেন।আটপৌরে মধ্যবিত্ত মিস্ত্রিভাবনায় তিনি সং ও সত্যকে আড়াল করেননি,নিছক কল্পনাবিলাস আর ভাবালুতায় আবিষ্ট হয়ে তাঁর সাহিত্যরথ অগ্রসর হয়নি।

তাঁর চার দশকের বেশি নিরবিচ্ছিন্ন সাহিত্য সাধনার দিকে মনোনিবেশ করলে দেখা যায় প্রায় দশকে দশকে তিনি দিকবদল করেছেন।আবার নিজস্ব সৃষ্টির স্রোতের মধ্যেই অন্য আবর্ত সৃষ্টি করেছেন।কিন্তু কখনই একই জায়গায় থিতু হননি।এই আত্ম-অস্থিরতার উচ্চাটনে ‘অমৃতকুস্ত্রের সন্ধানে’র সাফল্যের পরেও রচনার ক্ষেত্র আর বিষয় আবার বদলে ফেললেন।গঙ্গায় মাছমারাদের বিচিত্র জীবন,অনিশ্চয়তা,জল আর তার গভীরে

কালকূট ১০০, রঙ্গন

নিঃশব্দ পদসংঘারে উঠে আসে যে রূপালি ফসল.....সেই দিবারাত্রের বারোমাসা সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠে এল সমরেশ বসুর কলমে বাংলা সাহিত্যের এক ধ্রুপদী উপন্যাস ‘গঙ্গা’য়। এরই মাঝে কখন রচিত হয়েছে ‘বাঘিনী’,‘ত্রিধারা’। আর এর মধ্যেই মগ্নচিত্তে লেখক আরো এক তুমুল বাঁকবদলের জন্য দম নিচ্ছিলেন।পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাঙাগড়া, নিজস্ব ব্যক্তিজীবনের নানা উত্থালপাতাল তাঁর মনোজগতে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ তার ‘বিবর’,‘প্রজাপতি’,‘পাতক’ উপন্যাসগুলি যার কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা হয়েছে। এর পরের বাঁকবদলের প্রতিচ্ছবি তাঁর ‘টানােপোড়েন’,‘খন্ডিতা’,‘শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’ কিন্না ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’ প্রভৃতি উপন্যাসে। আপাতদৃষ্টিতে এই উপন্যাসগুলোর পেছনে সত্তর দশকের উত্তাল সময়,নকশাল আন্দোলন ও সামাজিক টানােপোড়েনের ক্রিয়াবিক্রিয়ার অংশীদারীত্ব আছে মনে হলেও মগ্নপাঠক অবশ্যই আবিষ্কার করেন জীবন ও সাহিত্যের বন্ধন সেখানেও শিথিল হয়নি।

সময়,সমাজ, অভিজ্ঞতার নয়া উপলব্ধি একজন লেখককে সবসময়ই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়।যেমন সমরেশ বসুর ক্ষেত্রেও তাঁর লেখকজীবনের প্রথম পর্বের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের পরিবর্তনশীল বিষয় ও চিন্তাধারার তুলনা টানলে বোঝা যায়,ক্রমশঃ লেখাগুলোর মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে লেখকের চিন্তাধারার মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত।

সমরেশ বসুর সাহিত্য জীবনকে আমরা কয়েকটি পর্বে বিশ্লেষণ করতে পারি।এই পর্বগুলোর মধ্য দিয়ে সমরেশ বসুর সাহিত্যজীবনের নিরন্তর বাঁকবদল, পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কিছু দিকচিহ্ন আমরা খুঁজে নিতে পারি।

প্রথম পর্ব: ‘নয়নপুরের মাটি’ থেকে ‘গঙ্গা’

দ্বিতীয় পর্ব:

‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, ‘পাতক’, ‘স্বীকারোক্তি’।

তৃতীয় পর্ব: ‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, ‘যুগ যুগ জীয়ে’, ‘শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে’, ‘তিন পুরুষ’।

চতুর্থ পর্ব: এক নতুন রূপের প্রকাশ, যা

দুর্ভাগ্যবশতঃ অসমাপ্ত থেকে যায় ‘দেখি নাই ফিরে’

উপন্যাসে। এর পাশাপাশি লিখেছেন প্রায় দুশো

ছোটগল্প যা উপন্যাসগুলির মতোই জীবন

চেতনা, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি ও সমাজ চেতনায় ঋদ্ধ।

কালকূট নামে রচিত উপন্যাসগুলিকে মূলতঃ

পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। যেমন প্রথম দিকের

রচিত উপন্যাসগুলিকে নিয়ে বলা যায়—তীর্থ

পরিক্রমা। এরপর প্রেক্ষাপট পরিবর্তিত হয়ে নিবন্ধ

হয় অরণ্যে, পুরাণের অনুষঙ্গে মানসভ্রমণে, নগর

জনপদ পরিক্রমায়, বিচিত্রের সন্ধানে।

সমরেশ বসুর সাহিত্য রচনার ব্যপ্তি ও বহুমুখীনতা

যে কোন লেখকের শ্লাঘার বিষয়। এর সঙ্গে সুনিপুন

তালে সঙ্গত করেছে তার বিচিত্র শব্দভান্ডার এবং

তার পাশাপাশি প্রয়োগ-কুশলতা। এই অনিশেষ

শব্দভান্ডারে আমরা পাই দীনাতিদীন অতি অন্ত্যজ

শব্দমালা থেকে অতি উচ্চকোটির আলঙ্কারিক

শব্দবিন্যাস। আর তার সুকুশলী প্রয়োগ আ্যাতোটাই

ধ্রুব, যে উচ্চাঙ্গ সাহিত্যরস সৃষ্টিকে তা বিন্দুমাত্র

ব্যাহত তো করেই না বরং ধারণ করে এক পরম

ধাত্রীরূপে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমরেশের

সাহিত্যজীবন কোন কল্পনাবিলাস বা ভাববিলাসের

ফসল নয়। তেমনটা হলে ভাবের ঘরে সে চুরি

ধরতে পাঠকের অসুবিধে হোত না এবং তার

স্থায়িত্বও হোত ক্ষণস্থায়ী। আসলে তাঁর এই

বিচিত্রগামী স্বর্ণ- আখরের মাস্তুল তো তাঁর

ব্যতিক্রমী, বাউন্ডুলে জীবনসাম্প্রদায় আঁটায়

বাঁধা। কোন সন্দেহ নেই জীবনের অনেকটা সময়

কেটেছে তার নিদারুণ দারিদ্র্য, রুটিরোজগারের

ধাক্কা লিপ্ত হতে হয়েছে নানা বিচিত্র ক্রিয়াকর্মে

আর জীবনের এই অভিমুখ তাঁকে সম্পৃক্ত করেছে

সমাজের নিম্নবর্গীয়, উপেক্ষিত তথাকথিত অন্ত্যজ

শ্রেণীর কাছে। এর সঙ্গে সোনায়ে সোহাগা হয়েছে

তাঁর কম্যুনিস্ট পার্টির সান্নিধ্য।

নৈহাটি, আতপুর্, জগদল এমনিতেই কলকারখানা ও

চটকলের আতুড়ঘর, বহুভাষাভাষী, বহুধর্মের

মিলনস্থল। পার্টির কাজে তাঁকে ঘুরতে হয়েছিল

শ্রমিক মহল্লায়, বস্তিতে, বস্তিতে। খুব কাছ থেকে তাঁর

দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাদের

জীবনসংগ্রামকে, ভাগীদার হতে হয়েছিল তাদের সুখ-

দুঃখ, হাসি-কান্না, লোভ-লালসা ও মানসিক

ঔদার্যের। আর এসব অভিজ্ঞতার রেণু রেণু পরম

মমতায় তিনি সঞ্চিত করেছেন তাঁর মনের

মণিকোঠায় যারা একেকটা মুক্ত হয়ে ঝড়ে পড়েছে

তাঁর সাহিত্য অঙ্গনে। দৈবনির্ধারিত এই অমূল্য

পারিতোষিকের উপলব্ধি কখনই সম্ভব ছিলনা দশটা

পাঁচটার গতানুগতিক অফিসযাপনে, ধরাবাঁধা

মধ্যবিশ্বের চৌখুপী নিরাপত্তার আশ্রয়ে নিজের

ব্যক্তিজীবনও তাঁর আর পাঁচজনের মতো একমাত্রিক

সরলরেখায় প্রবাহিত হয়নি, সেখানেও সর্বদা বেজে

গেছে এক শিকলছেঁড়ার আবহসঙ্গীত,

সমাজসংসারের অলিখিত তথাকথিত নীতি ও

অনুশাসন, ‘পাছে লোকে কিছু বলে’র মতো এক

সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ যা আমাদের ‘ভাবের

ঘরে চুরি’ করতে শেখায় এ’সব সমরেশ- জীবনে

টুসকি মেরে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি

স্বীয় অন্তরাত্মার ডাকে। সামাজিক মানুষ

সমরেশ, বিবাগী তো নন। সমাজের মধ্যে থেকে

সমাজের নিয়মনীতিকে অস্বীকারের মাশুল তাকে

গুনতে হয়েছে কড়ায়গন্ডায়। তবু তিনি নিজ কর্তব্যে

শিথিলতা দেখাননি বিন্দুমাত্র, অঞ্জলিপুটে গ্রহণ

করেছেন ব্যক্তিজীবনে প্রক্ষেপিত যাবতীয়

গরলভান্ডার, হয়েছেন কালকূট, এক তীব্র বিষের

আধার আর তাই বোধহয় সর্বদা তাড়িত হয়েছেন

সাহিত্য-সমুদ্রমহুনে সেই অমৃতকলস আহরণের

প্রচেষ্টায়। এ ও বোধহয় দৈবনির্ধারিত কোন

মেলবন্ধন, ব্যক্তিজীবনের টানা পোড়েন না থাকলে

হয়তো তার জীবনজিজ্ঞাসা এত তীব্র হোত না,

পর্বে-পর্বে ভোলবদল ঘটতো না তাঁর

সাহিত্যজীবনে, রচনার উপজীব্যে, তার অঙ্গসৌষ্ঠবে।

শুধু উপন্যাস নয়, সমরেশ বসু গল্পকার হিসাবেও

তুমুল আকর্ষণীয়, বহুদিক দিকের সাধারণের অধিকারী।

তাঁর ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য, আঙ্গিক, চরিত্রানুযায়ী

ডাইলেক্টের ব্যবহার, চরিত্রচিত্রণের মুসীমানা তাঁকে

এক বিরলধর্মী গল্পকারের মাত্রতা দিয়েছে। সমরেশ

বসু ছিলেন পূর্ণ সময়ের সাহিত্যসেবী। জীবনধারণের

জন্য জেল থেকে বেরোবার পর তিনি অন্য কোন

জীবিকায় নিযুক্ত থাকেন নি। এ প্রসঙ্গে এই

প্রতিবেদকের একটা পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে গেল

যার উল্লেখ আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সমরেশ

বসুর একনিষ্ঠ পাঠক হবার সুবাদে আমার ছোট

থেকেই কৌতূহল ছিল মানুষ যখন প্রচণ্ড আর্থিক

আতান্তরে পড়ে সে অর্থ উপার্জনের তাগিদে এধার

ওধার হন্যে হয়ে ঘোরে। বিশেষতঃ যদি সেই মানুষটি

হয় ঘোরতর সংসারী, মাথায় চেপে থাকে

স্ত্রী, সন্তানসন্ততির দায়ভার। জেল থেকে বেরোবার

পর যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদেয়

ভাতাটুকুও বন্ধ হয়ে গেল, স্ত্রী সন্তান নিয়ে বস্তিতে

আশ্রয় নিতে হয়েছে, হাতে সামান্য পয়সাটুকুও

বাড়ন্ত—কি বিশ্বাসে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁর

কলমখনাকে? ওই সময় সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর

তেমন পরিচিতি ছিলনা। লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা যদি

না পাওয়া যায় তাহলে? তাঁর কি স্বীয় প্রতিভার প্রতি

ছিল নিষ্কম্প বিশ্বাস যে তিনি একদিন না একদিন

বিখ্যাত হবেনই! যদিও এ কথা মনে না রাখা

অপরাধ হবে যে এ সময় তিনি এক মহিয়সী নারী স্ত্রী

গৌরীদেবীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছিলেন যিনি

তাঁর বিপুল পরিশ্রমে সংসার প্রতিপালনের অনেকটা

দায়ভাগ নিজের কাঁধে তুলে স্বামীকে নিবিড় সাহিত্যসাধনায় উৎসাহিত করেছিলেন। মনে আছে ১৯৮৩ সালে কোন এক নামকরা পাক্ষিকের বইমেলা বিশেষ সংখ্যার জন্য সমরেশ বসুর সাক্ষাৎকার নিতে তাঁর পার্ক সার্কাসের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে আমার এই কৌতূহল ব্যক্ত করে উত্তরের প্রত্যাশী ছিলাম। তিনি চুপ করে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। দৃষ্টি সামনের দরজা, বারান্দা ছাড়িয়ে বহুদূরে নিবন্ধ। কি যেন ভাবছেন। তারপরে ধীরে, অতি ধীরে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলেন “এ পোড়ার দেশে বঁচে থাকতে গেলে কত যে লিখতে হয়” তাঁর এই উত্তর হয়তো আমার প্রশ্নের যথার্থ প্রতিক্রিয়া ছিল না কিন্তু আমি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন যা আমি করবো ভাবছিলাম তার উত্তর পেয়ে গিয়েছিলাম। শুধুমাত্র অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে এবং সাহিত্য নির্ভরশীল জীবনধারণের তাগিদে তাঁকে হয়তো অনেক ফরম্যাশী উপন্যাস লিখতে হয়েছে যা হয়তো সমরেশীয় নয় কিন্তু এমন অপবাদ তাঁর গল্পের ক্ষেত্রে দেওয়া শক্ত। তাঁর সাহিত্যজীবনে গল্পসংখ্যা দুই শতাধিক। এবং তার লেখকসত্তার উন্মেষ ঘটেছিল গল্প লেখার মাধ্যমেই এই কথাটা ভুলে চলবে না কেননা তৎকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৬ সালে লেখা প্রথম গল্প ‘আদাব’--- ‘পরিচয়’ পত্রিকায় বেরোবার পরে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এরপরে একের পর এক লিখেছেন কালজয়ী অসংখ্য গল্প। বিচিত্র অভিজ্ঞতাপুষ্ট বাস্তব জীবনের এইসব গল্পে তিনি বারবার জীবন, জীবনসংগ্রামের কথা বলেছেন। সমাজে নিম্নশ্রেণীর মানুষগুলোর অভাব অভিযোগ, অসহায়তা, ক্ষুধার জ্বালা অন্যদিকে উচ্চশ্রেণীর মানুষের শোষণ নিপীড়ন সমরেশ বসুর বিভিন্ন ছোটগল্পে ফিরে এসেছে বারবার। তাঁর বিপুল অতি উচ্চ সাহিত্যরস-মন্ডিত গল্পগুলিকে নিয়ে আলোচনা এই স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়। তাবু ‘আদাব’

ছাড়া আরও কয়েকটি গল্পের উল্লেখ এখানে না করলেই নয়। ‘গুণীন’, ‘পাড়ি’, ‘উজান’, ‘শানা বাউড়ীর কথকতা’, ‘ছেঁড়া তমসুক’, ‘শিকল কাটার ছল’, ‘উত্তাপ’, ‘আটাত্তর দিন পরে’, ‘স্বীকারোক্তি’ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সমরেশ বসুর ছোটগল্প নিয়ে বলতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন— ‘ছোটগল্পে লেখকের আবিষ্কারের চক্ষু থাকা চাই। তিনি জীবনের এমন সমস্ত খন্ডাংশ নির্বাচন করিবেন যাহারা সাধারণত আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। যাহারা যুগপৎ প্রত্যাশিত ও রসসমৃদ্ধ। সমরেশ বসুর অধিকাংশ গল্পের উপরেই এই অসাধারণ ছাপ লক্ষ্য হয়। ভূগর্ভে প্রোথিত খনিজ সম্পদের ন্যায় তিনি মানব মনের অনেক গোপন, রহস্যময় স্তর, জীবন সংঘাতের অনেক বিচিত্র, অভিনব রেখাচিত্র উদ্ভাসিত করিয়াছেন।’

সমরেশ বসুর সাহিত্য বিচরণক্ষেত্রে কৈশোর সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য পদচারণা আছে। তাঁর ‘গোগোল’ চরিত্রটি কিশোর রহস্য উপন্যাসে এক জনপ্রিয় চরিত্র।

লেখক হিসাবে সমরেশ আমৃত্যু যে লড়াই করেছেন তার কোন তুলনা নেই। মৃত্যুকালেও তাঁর লেখার টেবিলে ছিল দশ বছরের অমানুষিক শ্রমের অসমাপ্ত ফসল। শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে। ১৯৮৭ সালের এপ্রিল মাসে, একটি মূল্যবান সাক্ষাৎকারে দিব্যেন্দু পালিত সমরেশের কাছে রামকিঙ্করকে শেষ লেখার বিষয় হিসাবে নির্বাচনের কারণ কি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেন, হয়তো তা রামকিঙ্করের সঙ্গে সমরেশের জৈবিক সাদৃশ্যের কথা ভেবেই। এই প্রশ্নের উত্তরে সমরেশের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

‘আমি নিজেই বিশেষ করে রামকিঙ্করের জীবন থেকে বুঝেছি যে আমার আর কোথাও কোনো সিদ্ধান্তই নেই। আমার একমাত্র সিদ্ধান্তই হচ্ছে

সেইদিন যেদিন আমি নিজে যে শিল্প গড়তে চেয়েছি, সেদিকে যেতে পেরেছি’।

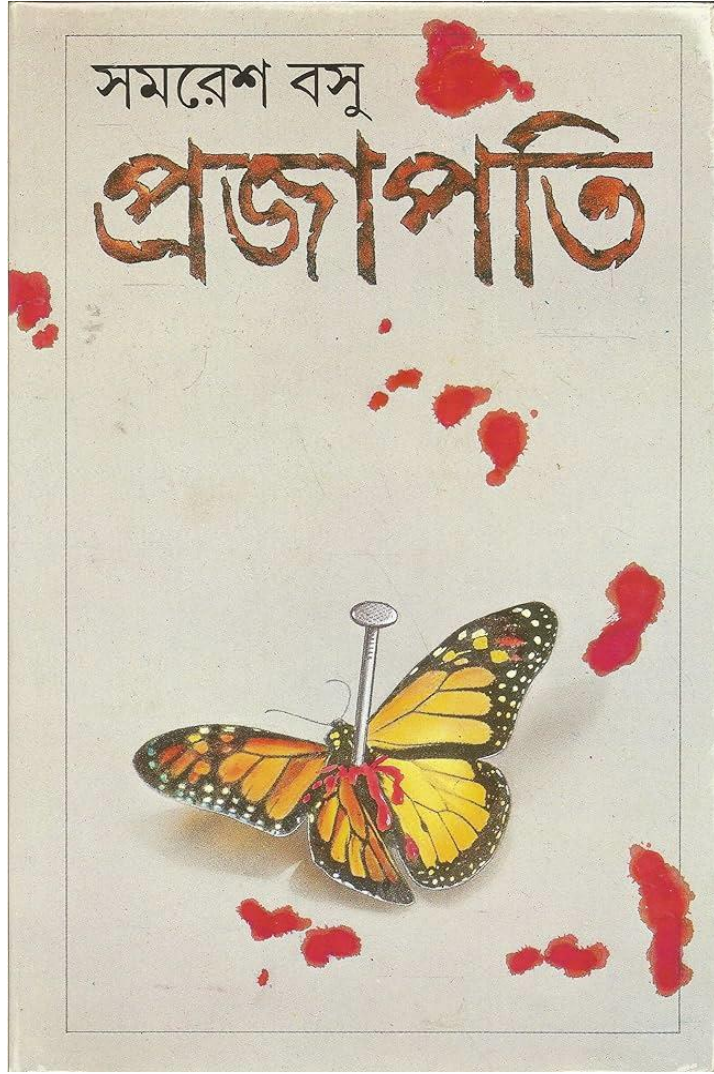
হৃদয়তাড়িত যে উপন্যাসের সৃষ্টিতে তিনি ব্যয় করেছিলেন তাঁর অসুস্থ শরীরের দশ দশটা সুদীর্ঘ বছর, রোপন করেছিলেন এক দীর্ঘ লালিত স্বপ্নের চারাগাছ— তা মহীরুহ না হতে পারা বাংলা সাহিত্যসম্প্রদায়ে এক মর্মান্তিক ট্রাজেডি। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘নয়নপুরের মাটি’ ও শেষ লিখিত ‘দেখি নাই ফিরে’ উপন্যাস দুটির মধ্যে একটিতে চরিত্র মহিমের শিল্পী হয়ে ওঠার স্বাদ শেষ উপন্যাসে বহমান আবর্তন চক্রে পূর্ণতা পায়। সমরেশের শেষ ও গুরু সেই মাটির টানে। যেন এই দুটি রচনার মধ্য দিয়ে সমরেশের নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আর্তি মূর্ত হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সমরেশ বসু নিজেই ভাল ছবি আঁকতেন ও কে জানে রামকিঙ্করের বোহেমিয়ান, বেহিসাবী, বর্ণময় চরিত্রই শুধু রামকিঙ্করের প্রতি তাঁর আকর্ষণের একমাত্র কারণ কিনা, প্রচ্ছন্দে হয়তো তাঁর অপ্রস্তুতিটিকে অঙ্কন-অনুরাগ দোহারের ভূমিকা পালন করেছিল।

এক লেখকের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হয় কালের কষ্টিপাথরে। কিন্তু জীবদ্দশায় সাহিত্যিক হিসাবে সমরেশ বসুর স্থান যে ছিল খুব উচ্চ কোটিতে এবং তিন বা ডুজের পরে বাংলা সাহিত্য তাঁর লেখনীর মায়াময় জাদুতে দীর্ঘসময় আবিষ্ট ছিল এতে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। যেহেতু বিপ্লব মানুষের সংগ্রাম ও উত্তরণের অন্বেষণই তার সাহিত্যের ভরকেন্দ্র, পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থানেও যদি জীবনযুদ্ধে মানুষ বিপ্লব ও প্রগীড়িত থাকবে, সমরেশ বসুর সাহিত্যকৃতিও ততদিন প্রাসঙ্গিক ও অমলিন থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

তথ্যসূত্র:

1. বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিমান লেখক সমরেশ
বসু যার দ্বিতীয় সত্ত্বা কালকূট—নর্থ বেঙ্গল
ইউনিভার্সিটি।
2. জীবনশিল্পী সমরেশ বসু: প্রসঙ্গ তার ছোটগল্প—
নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি।
3. সমরেশ বসু: শান্তি উমা মুখোপাধ্যায়
4. সাহিত্যের ও জীবন যখন অঙ্গাঙ্গী—আনন্দ
বাজার <https://www.anandabazar.com>



সমরেশ বসুর

প্রজাপতিঃ

অশ্লীলতার গণ্ডি

ছাড়িয়ে জীবনের

প্রতিচ্ছবি

মৃণালপাল

কালকূট ১০০, রঙ্গন

লা সাহিত্যে যে কয়টি বই বহুল আলোচিত বা সমালোচিত তন্মধ্যে সমরেশ বসুর "প্রজাপতি" বাং উপন্যাসটি অন্যতম। বাস্তবধর্মী এই উপন্যাসটির প্রকাশক দেজ পাবলিশিং ১৯৬৭ সালে বইটি প্রকাশের পর থেকেই শুরু হয় গুঞ্জন। বারবার বইটি ক্ষতবিক্ষত হয় পাঠক আর সমালোচকদের হাতে। শেষপর্যন্ত আদালতে অশ্লীলতা-দোষে দুপ্ত হয় আলোচ্য উপন্যাসটি। বাংলা সাহিত্যে এমন অভিযোগ সত্যিই বিরল। নিষিদ্ধ হয় বইটির প্রকাশ, প্রচার। কিন্তু সত্যি কি এমন হওয়া জরুরী ছিল!

সমরেশ বসু কথাশিল্পী। তিনি সমাজের চাম্ফিক রূপকার। তাঁর গল্পে - উপন্যাসে ফুটে উঠেছে সমাজের প্রকৃত চিত্র। সেই বাস্তব ছবি বড় ভয়ানক। নারী-পুরুষের সংরাগ-সংসক্তি তাঁর সৃষ্টির অন্যতম বিষয়। সমাজে ঘটা দুর্নীতি, ব্যাভিচার, সকল প্রকার অসঙ্গতির তিনি নির্মোহ চিত্রকর। "উত্তরঙ্গ", "সওদাগর", "শ্রীমতি কাফে" থেকে শুরু করে "বিবর" পর্যন্ত তাঁর লেখনীর এই প্রবণতা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। কিন্তু শুধু শ্লীলতা অশ্লীলতার বেড়াজালে তাঁর সৃষ্টিকে আবদ্ধ করা যায়না। তাই সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত বলেছেন - "এই একজন : যাঁর মধ্যে একত্র হয়েছিল তারশঙ্করের অভিজ্ঞতা, বিভূতিভূষণের অনুভূতিপ্রবণতা, মানিকের প্রশ্ন, সতীনাথের পটভূমিজনিত ভিন্নতা। বাংলা গল্প-উপন্যাসের বিপুল ভারসম্পন্ন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে সমরেশ বসু হয়ে ওঠার জন্য তাঁকে যুক্ত করতে হয়েছিল নিজের সময় ও মানসিকতা, নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গি-সাহস, স্পষ্টবাদিতা এবং একের মধ্যে বহু। নিজের সব মেধা ঢেলে সাজিয়েছেন তাঁর সৃষ্টিকর্ম। সমাজ থেকে নিয়েছেন উপাদান ও উপকরণ। রচনাগুলো করতে চেয়েছেন সরস আর বাস্তবধর্মী। আর তাতেই তিনি হয়েছে কালকূট।" (এক ধরনের আশ্রয়, দেশ, ১৪ মে ১৯৮৮)।

"কালকূট" মানে তীব্র বিষাদ। এটি তাঁর ছদ্মনাম। "অমৃত কুস্তুর সন্ধানে", "কোথায় পাব তারে" সহ অনেক উপন্যাস তিনি এ নামে রচনা

করেছেন। কিন্তু সমাজ থেকে আহরিত মননের তীব্র বিষ তিনি প্রয়োগ করেছেন "বিবর", "প্রজাপতি"র মতো উপন্যাসে।

তাঁর এই বহুল আলোচিত বই প্রজাপতি ১৩৭৪ সালে 'শারদীয় দেশ'-এ প্রকাশিত হয়। একে অশ্লীল হিসেবে শনাক্ত করেন তরুণ অ্যাডভোকেট অমল মিত্র। তিনি বইটি নিষিদ্ধ করার জন্য আদালতে মামলা করেন। সেটা ছিল ১৯৬৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। আবেদনকারী তাঁর পক্ষে ৮ জন সাক্ষীর নাম দেন। সাক্ষী হিসেবে তারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও ছিল। ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের নাম। দুইজনের কেউই পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষী দিতে আসেননি। আসামী হিসেবে ছিলেন সমরেশ বসু এবং দেশ-এর প্রকাশক ও মুদ্রাকর সীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত। এবং সমরেশের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহের মতো ব্যক্তির।

কলকাতা আদালতে এ নিয়ে দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া চলে। সুধীসমাজে তো বটেই আদালত পাড়াতেও ছিল টানটান উত্তেজনা। কলকাতা চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বাদীপক্ষ অভিযোগ আনেন যে প্রজাপতি উপন্যাসটি অশ্লীল ও সাহিত্যের পবিত্রতা নষ্টকারী। এ উপন্যাস সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ভরপুর এই উপন্যাস যুব সমাজের সুকুমারবৃত্তির শত্রু। সাহিত্যে মাধুর্য, নৈতিক শক্তি উজ্জীবনী বৈশিষ্ট্যের স্থলে 'প্রজাপতি'র মতো রচনা কামনার জোগান দিয়েছে মাত্র। এর সামাজিক ও সাহিত্যমূল্য কোনোটিই নেই।

অন্যদিকে সমরেশ বসুর উপন্যাসটি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু বলেন, তিনি এতে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাস্তবতার ছবিই পেয়েছেন। এর ভেতরে অশ্লীল বলে কোনো কিছুই তাঁর চোখে পড়েনি। আর সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীলতার কোনো মাপকাঠি নেই। এই অভিযোগে রামায়ণ - মহাভারতের মত মহাগ্রন্থ অভিযুক্ত হতে পারে। উপন্যাসের নায়ক ও এখানে উপস্থাপিত নারী-পুরুষ এবং তাদের

কর্মকাণ্ডে যে নষ্টামি বা অশ্লীলতা, তা সময়েরই প্রতিচ্ছবি। এই ছবি বাস্তবসম্মত। লেখক এর মাধ্যমে সমাজের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নরেশ গুহও প্রায় বুদ্ধদেব বসুরই প্রতিধ্বনি করেন। এখানে ব্যবহৃত শব্দাবলি আগে কখনো ব্যবহার হয়নি। তিনি প্রসঙ্গ টেনে বলেন, রবীন্দ্রনাথও অনেক শব্দ ব্যবহার করছেন, যা তাঁর আগে কেউ কখনো ব্যবহার করেননি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সমরেশ বসু আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য এ বইয়ের লিখিত বিবৃতি তৈরি করেন। উপন্যাসের নায়ক সুখেন। মূলত সুখেনের ওপরই সমরেশের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। বিবৃতিতে তিনি এ উপন্যাসের গঠন, চরিত্র চিত্রণ এবং সুখেনের জীবন ও তাঁর কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বাবার দুর্নীতি, দাদাদের দলীয় রাজনীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার করা সব সুখেনের মনকে তিক্ত করে তোলে। সে বেথাগ্লা হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অবাধ্য। জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ। মূলত এ উপন্যাস তাঁর জীবনের শেষ চব্বিশ ঘণ্টার কাহিনি।' তাঁর মতে, কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক লোক সুখেনের মতো মস্তান চরিত্র দিয়ে প্রভাবিত হতে পারে না। বরঞ্চ যাদের বিপথে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা সাবধান হবে। বইটির বিবৃতি সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মামলার রায় বাদীর পক্ষে যায়। সমরেশে বসুর প্রজাপতি নিষিদ্ধ হয়। ১১ ডিসেম্বর, ১৯৬৮ সালে রায় ঘোষণা করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এ দিনটি ছিল সমরেশ বসুর জন্মদিন। এতে বলা হয়, 'উপন্যাসটিকে অশ্লীল বলে ঘোষণা করার পর তার লেখক সমরেশ বসুকে কোনো মতেই অব্যাহতি দেয়া যায় না। তা তিনি যত বড়ো লেখকই হোন না কেন? এই মন্তব্যসহ আমি তাঁর আলোচ্য উপন্যাসকে (প্রজাপতি) অশ্লীল ঘোষণা করছি। তাকে সাজাও দিচ্ছি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা অনুযায়ী তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করছি। ২০১ টাকা জরিমানা অনাদায়ে দুই মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের

আদেশ দিচ্ছি।" এবং প্রকাশককেও একই সাজা দেয়া হয়। এবং দেশ শারদীয় সংখ্যার (১৩৭৪) ১৭৪ থেকে ২২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নষ্ট করে দেয়ার জন্য বলা হয়।

আদালতের রায়ে সমরেশ বসু হাল ছাড়লেন না। তিনি মামলাটি হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। মামলাটি যতই দীর্ঘ হতে থাকে মানুষের কৌতূহলের মাত্রাও ততই বাড়তে থাকে। দুঃখজনকভাবে কলকাতা হাইকোর্টও ব্যাঙ্কসাল কোর্টের রায়ই বহাল রাখে। ১৯৭৯ সালে সমরেশ বসুর মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে ওঠে। আদালত থেকে ‘প্রজাপতির’ অনুবাদ চাওয়া হয়। শুনানি চলে ২০, ২২ ও ২৩ আগস্ট, ১৯৮৫ সালে। রায় প্রকাশিত হয় এক মাস পর। অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বলা হয়, "প্রজাপতি" অশ্লীল নয়। এবং সেই সাথে অভিযুক্তদেরও অভিযোগ মুক্ত করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি প্রায় বারোবছর ধরে চলে ছিল। সাগরময় ঘোষ-এই রায়কে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন। বাংলা সাহিত্যের কোনো উপন্যাস নিয়ে ১৭ বছর ধরে আইনি লড়াই এই প্রথম!

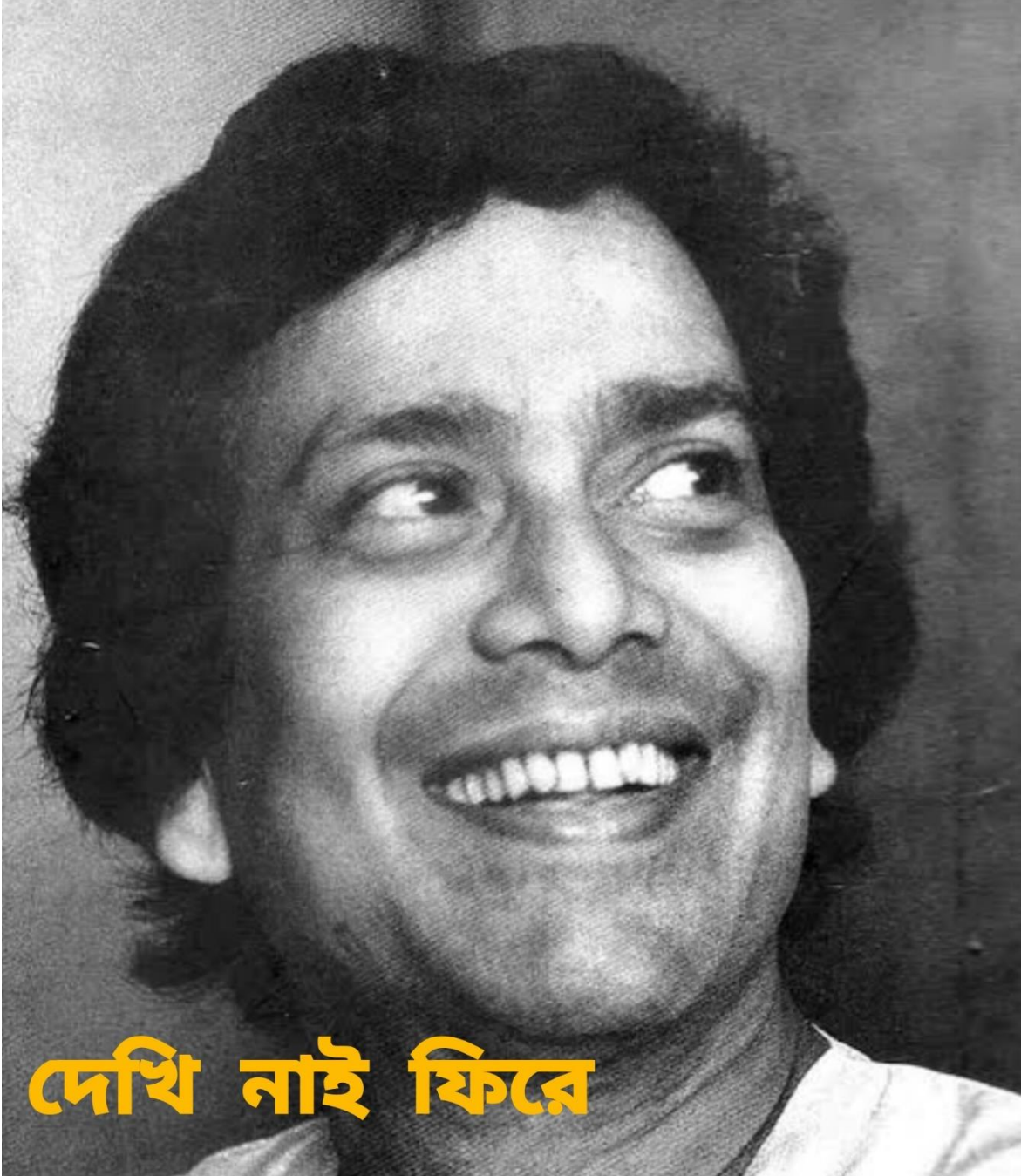
কলকাতা ও কলকাতার বাইরে অনেক আড্ডা, বৈঠক, আলোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে প্রজাপতি ও সমরেশ বসু। প্রজাপতি উপন্যাসের নায়ক সুখেন। মূলত তার জবানেই কাহিনি এগিয়ে চলে। সে সমাজের আঘাতে এক সমাজবিরোধী। চারপাশের মানুষের দুর্নীতি, লোভ আর অবক্ষয়ের কারণে সে ‘সুখেন গুন্ডা’! সকলে তাকে সমীহ করে চলে। এ কোন ভালবাসা নয়; ভয়। কারণ সবার ঘরের খবর, গোপন কথা তার জানা! কাহিনীর শুরু একটি প্রজাপতিকে ধরা নিয়ে। সুখেনের একরোখা প্রচেষ্টা আর শিখার তা রুখে দেয়ার প্রাণপন চেষ্টা থেকে। এরই মাঝে ফিরে ফিরে আসে পুরোনো ঘটনার srot- সুখেনের পরিবার, শিখার পরিবার, কলেজ জীবনের দাঙ্গাবাজী-হাঙ্গার স্টাইলের স্মৃতি কথা, পাড়ার কিছু ভদ্রবেশী মানুষের সুকীর্তির কথা, সুখেনের নারীজনিত নানা অভিজ্ঞতা নেতাদের নোংরামী-দলাদলি ইত্যাদি।

পাশাপাশি ব্যক্ত হয় শিখার প্রতি সুখেনের অজানা- অনাবিষ্কৃত আকর্ষণ। অন্যতম চ্যালা শিবের বোন মঞ্জুরীর সাথেও সুখেনের দেহজ সম্পর্ক আছে। এ ধরনের মুহূর্তকালের বহু সম্পর্ক সে গড়েছে- ভেঙ্গেছে, ভদরলোক বলে খ্যাত বহু বাবুদের স্ত্রী, মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু কোনটিই যেন শিখার প্রতি যে নেশা তার মত নয়। শিখার মধ্যে প্রতিনিয়ত কি যেন একটা অজানা কিছু খুঁজে পেতে চায় সুখেন। এই শিখার জনেই একসময় সাধারণ ছেলেটি হবার আকাঙ্ক্ষা পেয়ে বসে তাঁকে। স্কুল জীবনের নিরীহ শিক্ষক নিরাপদবাবুর মত নির্বিঘ্ন জীবনে ফিরে যেতে চায়। চোপড়া সাহেবের কাছে চাকরির কথা বলে সে নিজেই অবাক হয়! কিন্তু সমাজ, সংসার, মানুষ তাকে আর ফিরতে দেয় না। দাদাদের দলাদলি আর শত্রুপক্ষের নির্মমতার বলী হয় সুখেন। হরতাল চলাকালীন পক্ষ আর বিপক্ষদের যুগপৎ ছুটে আসা মিছিলের মুখে পরে এক দোকানে আশ্রয় নেয় সে। দাঙ্গার মাঝে উড়ে আসা এক সর্বনেশে বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সুখেনের সাধারণ কেউ হবার স্বপ্ন। হারাতে হয় চোখের আলো, পা আর হাত। এ উপন্যাসের কোন চরিত্রই অলৌকিক বা অতিলৌকিক নয়। সবাই বাস্তব জীবনের প্রতিভূ। সুখেন যেন রাস্তার সেই চিরচেনা গুন্ডা ছেলেটি। মুখে যার অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড়, চোখে রঙ্গিন মদের নেশা আর মনে আপাত অশ্লীল ভাবনার বাসা। তবু সেই গুন্ডা হয়েও যেন ‘এই গুন্ডা’ নয় সুখেন। এই নয়টুকুর ‘হয়’ না হওয়াটাই আমাদেরকে ভাবায়। শেষ পরিণতি ভেতরটা কাঁপিয়ে দেয়। ঘৃণা কিংবা করুণা হয় না সুখেনদের প্রতি। আক্রোশ জন্মায় সমাজ আর তথাকথিত সমাজপতিদের প্রতি।

নারীদেহের বর্ণনা কিছু থাকলেও নারী- পুরুষের কোনো সঙ্গম দৃশ্যের বর্ণনা পর্যন্ত নেই এই বইয়ে। যেটুকু আছে তা আভাসে-ইঙ্গিতেই। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দাবলি তুলে আনা হয়েছে কলকাতার সেই সময়ের প্রচলিত সমাজবিরোধীদের কথাবার্তা থেকে। একটি গল্প বা উপন্যাস সার্থক হতে হলে বাস্তব মানুষের আচরণ ও সংলাপই মুখ্য।

কারণ, সাহিত্য সমাজের কথাই বলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি গল্পে নিজের জবানে একজন সমাজবিরোধী গুণ্ডার কথা বিবৃত হয়েছিল কিন্তু লেখক সমরেশ বসুর মনে হয়েছিল সে যে ভাষায় নিজের কথা বলছে তা রীতিমতো সভ্য, শিক্ষিত মানুষের ভাষা। এতে তার বয়ান কৃত্রিম হয়ে উঠেছে। সেই চিন্তা থেকে তিনি একজন লম্পট ও বখে যাওয়া ব্যক্তির জবানেই তাঁর নিজের কাহিনি বর্ণনা করতে চাইলেন। লেখা হলো ‘প্রজাপতি’। উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে সমরেশ বসু মূলত সমাজের ঘটে যাওয়া বাস্তবিক ঘটনাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দেশ পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অশোককুমার সরকার এ প্রসঙ্গে ইতি টেনেছেন ফরাসি সাহিত্যিকের একটি মন্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। শহরের রাস্তায় আবর্জনার ছবিসহ প্রতিবেদন ছাপা হলে কি কেউ ওই প্রতিবেদক ও ফটোগ্রাফারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়! কেউ কি তাদের আক্রমণ করে!

একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যে সমরেশ বসু একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম। কোনোভাবেই তাঁর এই ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না। বলা যায়, ফরাসি সাহিত্যের জন্য বালজাক যা করেছেন, বাংলা গল্প-উপন্যাসে সমরেশ বসুও সেই কাজই করতে চেয়েছেন এই বিতর্কিত সৃষ্টির মাধ্যমে। তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে করে তুলেছেন বাস্তবধর্মী। পুঁজিবাদের বিকার ও এর শিকারে পরিণত হওয়া দুই শ্রেণি থেকে তাঁর চরিত্রগুলি উঠে এসেছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে দেশপ্রেম, সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ও জীবনরহস্যসহ তাবৎ বিষয়। বিচিত্র বিষয় এবং আঙ্গিকে নিত্য ও আমৃত্যু ক্রিয়াশীল লেখকের নাম সমরেশ বসু। ভালোবাসাকে বুকে নিয়ে সমস্ত সামাজিক অসুন্দর ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই সত্যিই পাঠকের ভাবনার জগত নতুন করে উন্মোচিত করে।



বৃষ্টি ধারা দাশ গুপ্ত

কালকূট ১০০, রঙ্গন

“সমরেশ মানে মন। যুক্তি তর্ক বিচার
বিশ্লেষণ তার পথ নয়। তার দিশারী
মন...তাই তাকে কোন নির্দিষ্ট ছাচে
ফেলা যায় না। সে নিজেই তার ছাঁচ
গড়ে। অবহেলায় সেই ছাঁচ গুঁড়িয়ে দেয়।
সে একটা বাড়, একটা তুফান।”-- প্রিয়
বন্ধু সমরেশ কে এই ভাবেই দেখেছেন
রাম বসু।

পুত্র নবকুমার বসুর যথার্থ মূল্যায়নে,
“ভাবনায়, ভাষায়, অনুভবের গভীরতায়,
প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়-বৈচিত্রে চল্লিশের
দশকের এই লেখকের বিষয়ে ভাবতে
বসলে মনে হয়, কেবল তাঁর সাহিত্যসম্ভার
বা সৃষ্টিধারা নয়, তাঁর যাপিত জীবন,
জীবনবোধ, অভিজ্ঞতা, সামাজিক এবং
রাজনৈতিক বোধ-বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য
সম্পর্কেও আমাদের অনুসন্ধান এখনও
শেষ হয়নি।”

বাংলা সাহিত্যে চিরকালই ব্যতিক্রমী
লেখক সমরেশ। পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র,
রবীন্দ্রনাথ কিংবা সমসাময়িক
‘বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ী’ তারাশঙ্কর-মানিক-
বিভূতিভূষণ কারোরই লেখনরীতির ছাপ
পড়েনি তার রচনায়। ভাষার ধারালোতায়
বারবার উঠে এসেছেন শিরোনামে।
রাখঢাক ঢাক করে সত্যকে সাজিয়ে-
গুছিয়ে প্রকাশ করতে তিনি পারেননি
কোনোদিন বা হয়তো চাননি। সমাজের
শ্রমজীবী শ্রেণীর মুখের ভাষাও সরাসরি
উঠে এসেছে তার রচনায়। তাই হয়তো
অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে তার
‘বিবর’ কিংবা ‘প্রজাপতি’-র মতো
উপন্যাস।

বাংলা সাহিত্যে এই ‘বাড়’ সমরেশ বসু
প্রথম আলোড়ন ফেলে দেওয়া রচনা
‘আদাব’। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ‘পরিচয়’
পত্রিকায় প্রকাশিত এই ছোটগল্পটি আজও
সমরেশের সবচেয়ে আলোচিত রচনা। সে
গল্প লেখা হয়েছিল এমন এক সময়, যখন
ধর্মকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সবচেয়ে
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

সমরেশ বসুর রচনা কোনদিনই
সরলরেখায় চলেনি, তিনি লেখালেখি
নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই গেছেন
বারংবার। এক গভীর অতৃপ্তি নিয়েই
ক্রমাগত নিজের অন্তরে ডুব দিয়েছেন
তিনি। তুলে এনেছেন একের পর এক
মণিরত্ন। যে মানুষটা লিখতে পারেন
‘উত্তরঙ্গ’, ‘বি টি রোডের ধারে’ কিংবা
‘শ্রীমতি কাফে’-র মতো উপন্যাস, তিনিই
আবার সৃষ্টি করেছেন কিশোর গোয়েন্দা
চরিত্র গোগোল। আবার তিনিই ‘কালকূট’
নামে লিখে যান একের পর এক কালজয়ী
রচনা, ‘অমৃত কুন্ডের সন্ধান’ কিংবা
‘কোথায় পাব তারে’।

সাহিত্যে যিনি নিবেদিতপ্রাণ, সেই
তিনিই ব্যক্তিগত জীবনে ভীষণভাবে
বেপরোয়া। নিজেকে চিনিয়েছেন ভুলে
ভরা এক মানুষ হিসেবেই। বলেছেন,
“কাঠ খেয়েছি আংরা বেরুবো।” কোথাও
গিয়ে হয়তো বা অনুতাপেও জর্জরিত
হয়েছেন তিনি। নিজের “জায়া-জননী-
বন্ধু-কমরেড” গৌরীর সহোদরাকে
নিজের জীবনের দ্বিতীয় নারী হিসেবে গ্রহণ
করেছিলেন সমান্তরাল আরেক সংসারে
জড়িয়ে ছিলেন তিনি। তবুও মানুষটা যেন

চলছে। এই পরিস্থিতিতেই তিনি নিপুণ
হাতে ঐক্যেছেন এক মুসলমান মাঝি ও
এক হিন্দু সুতা মজুরের চিত্র। দেখিয়ে
দিয়েছেন ধর্ম কখনো দুটি মানুষের
ভ্রাতৃত্ববন্ধনের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে
না। তা কেবল শাসকের অস্ত্রমাত্র।

পাঁকাল মাছের মতোই। জীবনের এত
ক্লেশ-গ্লানি গায়ে মেখেও তিনি ঐষ্টা। তাই
হয়তো শেষ অসমাপ্ত উপন্যাস ‘দেখি নাই
ফিরে’-র আধার রামকিঙ্কর বেইজের
প্রতিকল্প হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি।

নবকুমার বসুর কথায়, “আসলে তাঁর
সমস্ত রচনা, সব সাহিত্যকর্ম তাঁর
জীবনযাপনের অঙ্গ। তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে
তুলত ব্যক্তির বিপন্নতা। নিজের জীবনের
সঙ্কটের মধ্যে দিয়েই উপলব্ধি করতেন
সেই বিপন্নতা, আর পর্বে-পর্বে তাই
প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর রচনায়।”

সত্যিই তাই। সমালোচকরা সমরেশ বসু
সাহিত্যকর্মকে ভাগ করেছেন চারটি মূল
পর্বে। প্রথম পর্বে ‘উত্তরঙ্গ’, ‘শ্রীমতি
কাফে’, ‘বি টি রোডের ধারে’, দ্বিতীয়
পর্বে ‘বিবর’, ‘প্রজাপতি’, তৃতীয় পর্বে
‘মহাকালের রথের ঘোড়া’, ‘শেকল ছেড়া’
হাতের খোঁজে বা চতুর্থ পর্বে
‘টানা পোড়েন’ কিংবা অসমাপ্ত জীবনী
মূলক উপন্যাস ‘দেখি নাই ফিরে’...
প্রত্যেকটি পর্বে, প্রতিটি উপন্যাসে
ভীষণভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবন

জিজ্ঞাসা। মানুষকে খুঁজতে চেয়ে তাঁর যে
পথ চলা শুরু হয়েছিল, তা পূর্ণতা
পেয়েছে তার আত্মবীক্ষণে। এই নিজেকে

খুঁজতে চাওয়াতেই তাঁর সার্থকতা।
অমৃতের সম্মানে এগিয়ে যাওয়া এই

মানুষটি তাই আজও, জন্মের শতবর্ষ
পরেও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. চৌধুরী, সত্যজিৎ, সেনগুপ্ত, নিখিলেশ্বর, সরকার, বিজলী, ১৯৯৪,

“সমরেশ বসু: স্মরণ-সমীক্ষণ”, চয়নিকা, কলকাতা।

পত্র ও পত্রিকা:

১. বসু, নবকুমার, “সাহিত্য ও জীবন যখন অঙ্গাঙ্গি”, আনন্দবাজার পত্রিকা, মার্চ ২৯, ২০২২

২. বসু, নবকুমার, “রেখে গেলেন অসম্পূর্ণ সৃষ্টি”, আনন্দবাজার পত্রিকা, জুলাই ১৫, ২০১৭

চলচ্চিত্র কালকূট



আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত চলচ্চিত্রের কাহিনীকার থেকে বাণিজ্যিক ছবির গল্পকার হিসেবেও বারবার দ্যাখা গেছে সমরেশ বসুর নাম।

ছোটগল্প

একটি চিরকুটের সন্ধানে

রু প ক বি শ্বা স

সহসা সেদিন যখন ওর কনসেপ্ট শোনাচ্ছিল, তখনই অনিকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল কাগজটা। ডাইরির পাতা ছেঁড়া রুলটানা কাগজ আর কাগজের উপর লেখা কিছু শব্দ। কিন্তু শব্দগুলো কিছুতেই স্পষ্ট মনে পড়ছিল না।

বছর ছয় সাত আগে লেখা কবিতা। অনিকের শেষ কবিতা। যা হিসেব মতো কেকার কাছে আছে। আছে কি? কেকা সহজে কোনও জিনিস ফেলে দেয়না। ওর কাছে গেলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আর এই ছবির কাজটার জন্য ওই কবিতাটা না পেলে কিছুতেই কিছু লিখতে পারবে না অনিকা।

হাওড়ার ব্রিজ পেরোচ্ছে ট্যাক্সি, সদ্য স্টেশানে কেনা খবরের কাগজটা খুলে

চোখ বোলাতে শুরু করে অনিকা। কিন্তু স্মৃতি চলে যাচ্ছে অনেক পিছনে।

‘আসবি বলে এলি না যে বড়?’
‘ইচ্ছে হল না আর। তাছাড়া যাবোই এমনটা তো জোর দিয়ে বলিনি কখনও।
তুই তোর মতো করে ঘোর না!’
‘আমি পুজোয় ঘুরতে খুব একটা ভালবাসি না। হৈ হুল্লোড়ে আমি তেমন একটা স্বচ্ছন্দ বোধ করি না। জানিসই তো।
না কি এখন সেটাও জানিস না বলবি?’
‘প্লিজ তোর এই পায়ে পা তুলে ঝগড়া করাটা বন্ধ কর’।
‘শুধু ঝগড়া কেন, ফোন করাটা বন্ধ করলেই সব থেকে খুশি হবি মনে হচ্ছে?’
তুই যে আসবি না বা শেষ অবধি এলি না সেটা একবারও তো কল করে জানানো

যেত? ফোন করলে নিশ্চয়ই আমি রাগ দেখাতাম না আজ?’

‘দ্যাখ, তুই তো কোনওভাবেই অল্প কথায় এই বিষয়টা শেষ করবি না, কাজেই শুধু শুধু ফোনের বিল নষ্ট না করে, নেক্সট উইক কলেজ খুলছে, কলেজে দেখা হবে, তখন কথা হবে’।

সেই নেক্সট উইকটা রেকর্ড করে রাখা ভিডিওর মতো এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসে অনিকের। ক্যাম্পাসের পিছনে এক ফালি বাগান, হরেকরকমের গাছের সাথে বাগানবিলাসের গাছ, রঙ্গন ফুলের গাছ, মাটিতে ছড়িয়ে সেই সব ফুলের পাপড়ি, পায়ে পায়ে পিষ্ট হয়েও কেমন হাসি হাসি মুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। সেই বাগানে ছুটির পরে অনিক কেকার সাথে কথা বলল শেষবার। পাঁচ নম্বর মানের প্রশ্নে যেরকম স্পষ্ট, ঠিকঠাক বিবৃত অথচ

যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর চাওয়া হয়, ঠিক ততটাই পরিষ্কারভাবে কেকা বলল, ‘আমি তোর সাথে কোনও ছলনা করেছি? মিথ্যে কথা বলেছি? তোর আমার প্রতি একটা সফট কর্নার আছে জানতাম বলেই যেদিন থেকে ইন্দ্রদার সাথে আমার রিলেশানশিপের শুরু, সেইদিন তোকে জানিয়েছি, যাতে তুই সবটা গুছিয়ে নিস ঘীরে সুস্থে। তারপরেও তুই ইচ্ছে করে আমার সাথে এইভাবে কথা বলিস। কিছু বলি না, ফাইন! কিন্তু অ্যাকিউস করবি কেন? দ্যাখ তুই আমার বন্ধু ছিলি, তাই আজকে তোকে এতটা সময় দিলাম সব ক্লিয়ার করার জন্য। আর এই যে এইসব কেন ফোন করিস না, কেন ওইদিন দ্যাখা করলি না এসব বলে বাগড়া করতে আসবি না। তোর একটা ফিলিংস আছে বলে তুই এইসব ভাবিস, আমার কিছু নেই তাই কিছু যায় আসে না। ক্লিয়ার?’

ক্লাস নাইনে একজন মাস্টারমশাই অনিককে ফিজিক্স পড়াতে আসতেন, অনিক যেমন পড়াশোনা খারাপ ছিল, তেমন ওই মাস্টারমশাইও পড়া বোঝানোর দিক দিয়ে খুব একটা পারদর্শী ছিলেন না, উনি একেকটা বিষয় খাতায় আঁকিবুঁকি কেটে বোঝানোর আশ্রয় চেষ্টা করে যখন বলতেন, ‘ইস ইট ক্লিয়ার?’, তখন অধিকাংশ সময়েই না বুঝে অনিক মাথা চুলকাতে। কিন্তু সেদিন কেকার কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে কান মাথা বাঁ বাঁ করলেও ওর জোরে ‘ক্লিয়ার?’ বলার পরে সব ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল। সত্যিই তো অনিকের কেকার প্রতি অনুভূতি থাকলেও কেকার যে তা নেই সে কথা সে শুরুতেই অনিককে জানিয়ে দিয়েছিল। এমনকই ইন্দ্রজিৎদার সাথে সম্পর্কে যাওয়ার পর সে কথাও নিজে থেকে অনিককে জানায় কেকা। কেকার রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। দুর্গা পুজোয় কোনওদিন ঘুরতে বেরোনো নিয়ে উৎসাহ না থাকা অনিকের সব জেনে শুনেও কেকার সাথে একদিন বেরোনোর অহেতুক সাধ হয়েছিল, নেহাত কেকা ওকে ভাল বন্ধু হিসেবে দেখত বলে রাজিও হয়েছিল। কিন্তু ওদের দেশের

বাড়িতে কী একটা দরকারে ওর মা বাবা চলে যাওয়ায় কলাকাতায় কেকা রইল একা, ইন্দ্রদার সাথে ঘুরে বেরাতে লাগল সারা দিনরাত। ইন্দ্রদা বাড়িতে ম্যানেজ করে ছিল পুজোর ক’টা দিন কেকাদের ফ্ল্যাটেই। শেষ পর্যন্ত হাতে বাকি ছিল আর দশমীর দিনটা। কেকার আর ইচ্ছে হয়নি বলে বিসর্জনের দিন আর রাস্তার ভিড়ভাট্টা ঠেলে অনিকের সাথে দ্যাখা করেনি। এসএমএস করে জানিয়ে দিয়েছিল অবশ্য সে কথা। কিন্তু ফোন করেনি বলে অহেতুক অভিমান আর রাগ দেখিয়েছিল অনিক। কেকার মুখে একটানা কথাগুলো শোনার পর নিজেকেই ‘অহেতুক’ মনে হতে লাগে অনিকের। মনের ভাব চোখে মুখে কখনো লুকিয়ে রাখতে পারে না অনিক, ছোটবেলা থেকেই, সেদিনও পারেনি, এমনকই ধরা গলায় স্বরও লোকাতে পারেনি, অস্ফুটে বলেছিল, ‘ক্লিয়ার’।

বোধহয় কিছুটা মায়ী হয়েছিল কেকার। নরম গলায় বলেছিল, ‘দ্যাখ আমি সবই বুঝতে পারছি, কিন্তু... সরি। আর ওইসব ভুলে যা। তোরই মন খারাপ হবে’।

এরপর থেকে আর কেকার সাথে সেভাবে কখনো কথা হয়নি অনিকের। অনিক তখন যে কোনও পুরুষ, তার ‘গায়ে শুধুই মাংসের গন্ধ’। অনিক তখন তিন বছরের সহপাঠী। কেকার হিসেব মতো এতেই অনিক দ্রুত কেকাকে বিস্মৃত হতে সক্ষম হবে, যা অনিকের পক্ষেই মঙ্গল। অনিকও কলেজ পাশ করার পর দীর্ঘ অদেখায় তাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। কিন্তু গোলমাল বাঁধল ছ’দিন আগে।

পড়াশোনায় অনিক চিরকালই নিম্নমধ্যবিত্ত, ঠিক ওর বাড়ির আর্থিক অবস্থার মতো। শেষের দিক থেকে দুটো বেস্ব ছেড়ে বসত স্কুলে। পড়া করে যাওয়ার চেষ্টা করত রোজ, কিন্তু মুখস্থ করতে পারত না সব। প্রশ্নমালা একের প্রথম পাঁচটা অঙ্ক করতে পারলেও হয়, সাতের দাগে গিয়েই হেঁচট খেয়ে যেত। বোর্ডের পরীক্ষায় অঙ্কে উনষাট, বিজ্ঞানের পেপারগুলো বায়ট্ট-তেষট্ট, ইতিহাস

ভূগোল একটু বেশি, বাংলা ইংরেজীও তাই, তবে সাতের ঘরে একটাও না। এই বিদ্যে নিয়েই পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিল কলেজে। তবে ইংরেজিটা ঠিকঠাক লিখতে পারত, বাংলাতেও বরঝরে গদ্য লিখতে পারত। সবাই বলেছিল সাংবাদিকতায় একটা ডিপ্লোমা করে নিতে, কাজ পেতে সুবিধে হবে। কিন্তু সেসব করার আগেই এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের সূত্রে উত্তরবঙ্গে একটা লোকাল কাগজের অফিসে কাজ জুটে গেল। অনিক আসলে কলেজে পড়াকালীন শিয়ালদায় একটা কম্পিউটার ইনস্টিটিউট থেকে ডেস্কটপ পাবলিশিং এর কাজ শিখেছিল, সেটাই কাজে লাগল।

বছর তিনেক ওখানেই কাজ করার পর কলকাতায় একটা কাজের সুযোগ এল, কিন্তু অনিকের আর কলকাতায় ফেরার বাসনা নেই তখন। পাহাড়ের কোলে ছোট মফসসলটাই বেশ লাগছে তখন ওর। বাবা মা নিজেদের মতো আছেন অন্য আরেক শহরে, সেখানে বছরে একবার দু’বার গিয়ে দাখা করে আসে, ওনারা বছরে একটা সময় নিয়ম করে আসেন। এই বেশ চলে যাচ্ছে, বেশি টাকারও প্রয়োজন অনুভব করে না অনিক, মাস মায়নেতে নিজের চলে তারপরেও অতিরিক্ত থেকে যায়। আর পাঁচ জন সাধারণ মানুষের মতোই জমা হতে থাকে ব্যঞ্চে সঞ্চয়ের খাতায়। নিপাট সাধাসিধে জীবনযাপন।

তবে তারই মাঝে মরুদ্যানের মতো বেঁচে ছিল কবিতা। কবিতা জন্ম নিত অনিকের মনের মধ্যে, কিন্তু কবিতা কখনও লিখত না ও। কবিতা অনুভূতির মতো ধাক্কা দিত, শব্দগুলো এলোমেলোভাবে বেরিয়ে আসত আর সেগুলকে ইমেজে ইমেজে ভাগ করে ছোট ছোট গদ্য লিখত। যেটা এক সময় সম্পাদক সুখময়বাবুর নির্দেশে ছদ্মনামে রবিবার রবিবার সাপ্লিমেন্টারিতে ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করে অনিক। একটা সময় দারুন পপুলার হয়ে গেলে ওগুলো একসাথে করে পুজো সংখ্যায় বিশেষ রচনা হিসেবে বের করে দিলেন সুখময়বাবু আর সেই সংখ্যায় কাগজ

একটা বড় কোম্পানির স্পনসরশিপ পেয়েছিল, পাকেচক্রে যেটা ছিল একটা ফিল্ম প্রোডাকশান কোম্পানি আর তাদের অন্যতম একজন ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার অনিকের লেখাপুলো পড়ে বসল।

‘একজন নতুন পরিচালক আমাদের সাথে কাজ করবেন, সহসা রায়। উনি ডকুমেন্টারিমেকার বেসিকালি। উনি কনসেপ্ট বলে দেবেন, আপনি সেই মতো এরকম কিছু ইমেজারি প্রোস লিখে দেবেন। ওনার সাথে কথা বললে আপনি বুঝতে পারবেন উনি ঠিক কী চাইছেন। তবে উনি যেটা চাইছেন সেটা আপনিই সব থেকে ভাল লিখে দিতে পারবেন বলে আমার মনে হয়।’

সুখময়বাবু অনিককে কাজটা করার অনুরোধ করলেন। এতে অনিকের নিজের কর্মজীবনেও যেমন গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ হবে, তেমনিও ওদের কাগজের সাথেও ওই প্রোডাকশানের সম্পর্ক ভাল হবে।

পরিচালক ম্যাডামের সাথে অনিক ছ’দিন আগে কথা বলেছে। উনি এসেছিলেন ওদের শহরে, লোকেশান দেখতে। এটা অবশ্য ওনার পারসোনাল একটা ডকুমেন্টারির কাজের জন্য, তবে একই শহরে বলে নিজেই অনিকের সাথে যোগাযোগ করে দেখা করলেন।

বিষয়টা অবসেশান। প্রবন্ধের মতো অধ্যায় ভাগ করে করে বানাবেন ছবি। অনিক সিনেমা সম্পর্কে অল্প বিস্তার খোঁজ খবর রাখে, ও জানে এই ধরনের ছবির ধরন। সহসা ওকে আরো ভাল করে বুঝিয়ে দেয় ঠিক কী ধরনের গল্প সে চাইছে। অনিক মন দিয়ে শোনে। সহসা জিজ্ঞেস করে, ‘ক্লিয়ার?’ অনিক মাথা নাড়ায়। ক্লিয়ার।

‘এই ফ্ল্যাটে মনিমালা দাশগুপ্ত থাকেন না?’ আবাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোককে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে অনিক। ভদ্রলোক খুব সম্ভবত অফিস বেরোচ্ছেন, ভুরু কুঁচকে অনিকের দিকে তাকিয়ে বলেন, ‘দাশগুপ্ত? উম... প্রশান্ত দাশগুপ্তর ফ্যামিলির কথা বলছেন?’

এই রে! কেকার বাবার নাম কি প্রশান্ত? কেকার মায়ের নামটা অনিক জানত শুধু। একটু থেমে অনিক বলে, ‘মানে আমি তো ঠিক ভদ্রলোকের নামটা... ওদের এক মেয়ে কেকা দাশগুপ্ত...’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রশান্ত দাশগুপ্তর ফ্যামিলি। গতবছর ওনাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখানের ফ্ল্যাট বিক্রি করে ওনারা চলে গেছেন।’

সেপ্টেম্বরের মেঘভাঙা রোদ। সকালে হাওয়ায় নামা থেকে মেঘলাই ছিল আকাশটা। এখন রোদ উঠল। কোথায় একটা উচ্চগ্রামে রবীন্দ্রসঙ্গিত বেজে উঠছে থেকে থেকে, আর তার মাঝে মাঝে রক্তদান শিবিরের বিজ্ঞপ্তি।

অলস পায়ে হাঁটতে থাকে অনিক। বছরের এইরকমই একটা সময় কবিতাটা লিখেছিল অনিক। সেদিন বাইরে একটুও হাওয়া ছিল না, মেঘ ডাকছিল না, বৃষ্টি পড়ছিল না, নিতান্ত সাদামাটা একটা গুমোট সেপ্টেম্বরের দুপুরে অনিক চুমু খেয়েছিল কেকাকে। অনিকের জীবনের প্রথম ও শেষ চুমু, মিথ্যে একটা চুমু। প্রেমহীন। কীভাবে যে আচম্বিতে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল স্পষ্ট মনে করতে পারে না। শুধু এইটুকু মনে করতে পারে, ওই প্রেমহীনতাকে বুঝতে পেরেই, নিজেকে হারিয়ে ফেলার ভয় থেকে কবিতাটা লিখেছিল অনিক। খাতাটা কেকার ছিল। কেকা কোনওদিন ফিরিয়ে দেয়নি সেই কবিতা, রেখে দিয়েছিল নিজের কাছে। কলেজ শেষ হওয়ার আগে পাতাটা চেয়েছিল অনিক, কেকা বলেছিল, ‘ইন্দ্রদাকে তুই হিংসে করিস। আমার উপর তোর রাগ। এই কবিতাটা সেদিন নিতে আসিস যেদিন তোর মধ্যে আর একটুও ঈর্ষা থাকবে না, মনটা এত ছোট থাকবে না। কবিতাটার মধ্যে প্রেম আছে, কিন্তু তুই প্রেমহীনতা থেকে লিখেছিস। তোর নিজের লেখা হলেও ও কবিতায় হাত দেওয়ার সময় এখনও আসেনি। যেদিন আসবে নিতে আসিস।’

সহসা ক্যামেরায় প্রবন্ধ লিখবে কবিতার ভাষা দিয়ে। সেই কবিতা খুঁজতে এসে কেকার সেদিনের কথা এই প্রথম অনুভব করেছিল। ভয় ছিল কেকার সাথে দেখা হলে আবার সেই পুরনো ঈর্ষা, রাগ জেগে উঠবে কিনা মনের মধ্যে। কিন্তু এখন আর সেসব কিছু নেই। এখন এতটুকুও ঘৃণা ছাড়া মনে হচ্ছে ছবির জন্য আপনিই গদ্য লিখে দিতে পারবে অনিক। যে ছবি দেখলে কেকা যেখানেই থাকুক না কেন, মিলিয়ে নিতে পারবে ওর কাছে থাকা কবিতার সাথে।

কোথা থেকে যেন দমকা একটা বাতাস দিল। সেদিনও দিয়েছিল, চুম্বনের শেষে, কেকার চোখে চোখ রেখে তাকানোর পর। বাগানবিলাসের পাণ্ডি এসে পড়ছিল গায়ে। সেদিনের কেকা যেন ডেকে উঠল কোথা থেকে, ‘ইস এভরিথিং ক্লিয়ার?’

মাথা নাড়ে অনিক। বলে, ‘বুঝু। বুঝলাম শব্দের ক্লিপিং সংস্করণ। কেকার তৈরি সংস্করণ। আজ অনেকদিন পর উচ্চারণ করল অনিক। মনে হল অনেকদিন বুকের ভিতর জমে থাকা কবিতার অক্ষর নিয়ে এল ঠোঁটে।

কবিতা খুঁজতে এসেছিল অনিক, কবিতার সাথে কেকার না বোঝা স্মৃতি নতুন করে বুঝে ফিরে যাচ্ছে অনিক।

কবিতা

নেশা

নজর উল ইসলাম

আতসবাজি ছুঁড়ে দিলে অতিভাষনের মুখ
ভূগোল ঠুকরে পেশি আর চতুরতায়
পার্বতী মেঘ দেখেছে যা চুপিচুপি
কেউ কেউ ধূসরেও তীব্র শালুক

আজও সহনশীল চাষীর বুক
মরেও পায়রা ওড়ায় বিপন্ন মন-পাড়ায়
চাকা ঘোরে বিশ্বস্ত্রী চরণচিহ্ন জীবাস্বাসার

আঁটি ভাঙে ছন্দের জনযোজনা, সব চেতনা-পাখি
আসে না কেবল মন-মজদুরি, নিরুদ্দেশের জীবন পালক
চড়া মেঘ চড়া হয়, রোদ্দুর তাতায় বড়, ভাসা পানা —
সরবতি জলে শুধু মিশে থাকি অঘোর নেশায়...

রক্তের অঞ্জলি

আহমদ সাইফ

ঘূর্ণিতোলা মেঘের ভান্ডার খুলে দেখি-
কুয়াশার আবরণ মুছে গেছে।
বাসন্তী সোনা রোদ তোমার ললাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে!
একবিন্দু অরক্ষিত পুষ্প মায়ার আলিঙ্গনে ছলছল করছে।

তোমার দু গালের মাংসল অংশে রক্তের অঞ্জলি -
যেন এক মায়াবতীর নৃত্য!
ইচ্ছে মৃত্যুর মত নিরাপদে শীতের বিদায়,
উষা জনান দিলো বসন্ত কন্যা।

কোন এক বসন্তের মধ্যাহ্নে প্রার্থনা করেছিলে বরাপাতার কংকাল হতে!
তুমি কংকাল হয়ো না প্রিয় বাসন্তী।

তুমি দিলরুবা হয়ে আমার অঞ্জলি হও,
হও ক্রমাগত বেঁচে থাকার স্বপ্নসাধ।

বসন্তের কোকিল আর কৃষ্ণচূড়ার আবির হও,
হও শিমুল পলাশ আর চৈত্রের প্রথম চুম্বন!

ক্ষয়

তন্ময় কবিরাজ

তোমার কথা মত এক পাহাড় ভেঙে দেখি
সামনে আর এক পাহাড়, সঙ্গে নদী
আমি হতাশ হলে পাহাড় হাসে
"আমরা পরিবার মাঝে চীনের প্রাচীর
এঁকেবেঁকে, সবাইকে নিজের ভেবে
ভুল করো কেন বারবার?"

আমি পালাবো কোথায়
সোজা রাস্তায় বলেছিলে সমতল পাবে
আমার চারদিকে জঙ্গল
আমি অভিমুখ্য - আমার কাছে আলো নেই
শুধু আকাশ ভর্তি পাখি
আমার চিৎকার থামিয়ে তাদের আনন্দে
আমাকে সামিল হতে বলে গেলো -

নুরি বলে, অপেক্ষা
আমিও তার মত ভেসে বেঁচে যাবো একদিন
শুধু ক্ষয় হবে, বাকি সব একই!

কোথায় পাবো তাকে

দিলীপকুমার দাস

এসেছিল যখন সে মলয়জশীতলাং
ছেটনদী মাঠঘাট খানকয় পাটকাঠি
কাঁচারোদে অহর্নিশ
মুখরিত প্রতিদিন ধানভরা ক্ষেত
টানাপোড়েন যা কিছু
সিটমারের অপেক্ষা -

তারপর বস্তু -
নিরন্ন মানুষের গুঁড়ো গুঁড়ো ভিড়
সামমুখ গাথা চটকল মোড়
পথে পথে নির্যোষ
ফেরিওয়ালার -

গালফোলা গিরগিটি অজস্র তখন

জবাব না পেয়ে কোন

ঘুরে ঘুরে অস্থির -

প্রশ্ন যেন - কোথায় পাবো তারে ?

কাকে ?

শতবর্ষ পরে আজ খোঁজ নিলে লোকটার

অবশেষ দাহ ছাড়া মিছে বকে মরা

কালকূট অগোচরে

বৈরাগী তখন -

অমৃত কুন্ডের সন্ধান সুন্দর -

ওদিকে আবার -

আরব সাগরের জল লোনা বলে তাই

সিঁদুরের ঔজ্জ্বল্য বা পায়ের আলতা

হৃদয়ের মুখ হলে

লবনাক্ত প্রতিদিন ধ্যান গ্জন প্রেম -

এত মানুষের চলা এত বছরের

এখন আর কি -

ভারী ভারী কথা শুধু

নিঃশব্দ বিলাপ, বস্ত্রপচা গল্প আর

ঝোপ বুঝে কোপ মারা

কাঁসর বাজানো -

পুনশ্চ একটাই - কোথায় পাবো তারে ?

যুদ্ধ ছক

শুভদীপ দত্ত প্রামানিক

তিনজন , তিনটি ছায়া একে অপরের খুচরো মনোবাঞ্ছা থেকে পিছিয়ে

কাক - চোখ - পুরনো অক্ষের পাং

তথাপি ; কেউ কি নেই মেরুপ্রদেশের আত্ম গীতে নিয়ে যাবার

টুকরো গমনের সংযম দোতারাত্র মাত্র ।

কাঁচে আলিঙ্গন করে মাকড়সা

খয়েরি পাখি দেখছে জাদু

ওড়নার গভীরে ভাঙা আয়নার আলপথ

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাদুর দেখছে আগামী যুদ্ধ পরিস্থিতির ছক !

তিনটি ছায়া পড়ে ধানের সংলাপ

যত মেঠো তত অষ্টাদশী রূপকথা নয়

রূপ বেঁচে থাকে রক্ত জবার ঘ্রাণে

একশো আট পলাশ যোগ দিচ্ছে কবিতা বান্ধব পার্টিতে ।

তিনজন

তিন দিকে ছুটে ছুটে লাল জামা পরে সাদরি ভাষার শব্দে ।

জর্জরিত রোদের প্রলাপ

উৎপল দাস

ওআরএস শুষে নিয়েছে জামা-কাপড়ের নগ্ন সংলাপ। যাবতীয় হলুদ উড়ে যাচ্ছে শরীর থেকে অথচ আকাশের নীলে জমছে প্রাপ্তবয়স্ক খতিয়ানের ভুল বোঝাবুঝি। একঘটি জলের ভেতর সাঁতার দেওয়া জীবাণুর মনে বাসা বাঁধা জন্মান্ত কুসংস্কার নেই; তারা জানে সেবা নামের মিথ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এজন্য সূর্যের দিকে তাক করে বসে আছে পাখির শিরদাঁড়া, নেই অথচ আছে, এই ঘোরেই কে কার প্রেম ছেড়ে বেরিয়ে আসে রাস্তায়। উন্মাদ কুমড়োর শরীরে হিম লেগে থাকে, কেউ কেউ বলে শব্দ ধোঁয়া। প্রদীপের সলতে থেকে একত্রিত হয়েছে যে আগুন, তার আঁচে ঢেকে যায় মুখ— বিজ্ঞাপন। কোনও এক দুপুরের লু-এর সাথে ভেসে যাওয়া আদ্র্ভতা, আম-পোড়া সরবতে ডুব দেয়। জানা যায় চুল্লির পাশে বেরিয়ে আসা পোড়া হাড়ের সাথে গুঁড়ুগুঁড়ো শিরদাঁড়া মিশে থাকে। আত্মজন কোনও একটুকরো শিরদাঁড়া তুলে নিয়ে যায়, শেষ স্মৃতি চিহ্ন রূপে।

প্রতিতুলনা

আরণ্যক দাস

সবাই ছুটছে,

কেও কেও একলাফে গন্তব্যে পৌঁছে যাচ্ছে।

তাই কি যাওয়া যায়? - ভেবে কত সময় নষ্ট করেছি নিজের!

'তুই কি আদৌ জানিস...?' বলে দু'একজন জানিয়ে যায় বর্তমান পরিস্থিতি।

'ছেড়ে দে ভাই।' বলা ছাড়া পালানোর আর কোনো রাস্তা পাইনা।

ওরা আমাকে দেখে

আমি দেখি মাটি।

আজ কাল হালচাল



পৃথিবীর তিন বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসবের মধ্যে অন্যতম কান চলচ্চিত্র উৎসব। এই বছর উৎসবের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ১৪ মে থেকে ২৫ মে। উৎসবের অফিশিয়াল পোস্টারে ব্যবহার করা হয়েছে আকিরা কুরোসোয়ার ১৯৯১ সালের ছবি ‘রাপসাদি ইন অগাস্ট’ ছবির একটি দৃশ্য। এই উৎসবের প্রধান জুড়ি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন গ্রিটা গিরুইগ।

লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট বা হনাররি পাম পুরস্কারের জন্য মনোনীত নাম প্রতিবারের মতো এইবারেও প্রথমেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন মার্কিন চিত্রপরিচালক জর্জ লুকাস, মার্কিন অভিনেত্রী মেরি লুইস এবং অ্যানিমেশনে অবদানের জন্য জাপানের একটি অ্যানিমেশন স্টুডিও যিবলি।

প্রতিবারের মতো এবছরেও মনোনীত চলচ্চিত্রের তালিকাতে ভারতের ছবির নামও রয়েছে। বলিউড তারকাদের র‍্যাম্প ওয়াক থেকে চোখ সরালে দিব্যি দ্যাখা যাবে সেইসব ছবির নাম।



GUJARAT CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD.



FESTIVAL DE CANNES
2024 OFFICIAL SELECTION
CANNES CLASSICS

500,000 FARMERS OF GUJARAT

Presents

MANTHAN

(THE CHURNING, 1976)

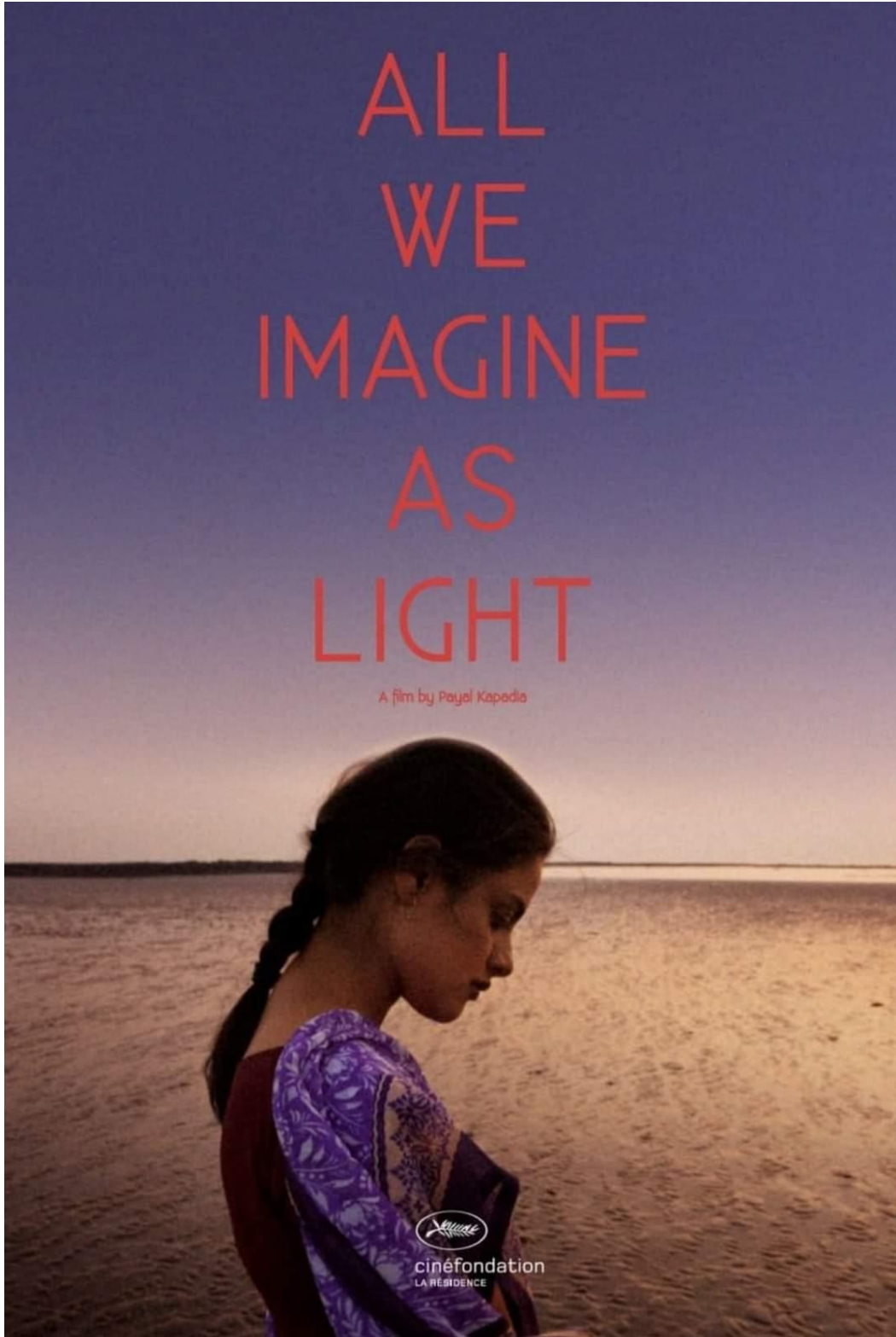
A film by SHYAM BENEGAL

Restored by FILM HERITAGE FOUNDATION

Cast: GIRISH KARNAD, SMITA PATIL, NASEERUDDIN SHAH, ANANT NAG, AMRISH PURI, KULBHUSHAN KHARBANDA, MOHAN AGASHE, SADHU MEHER, RAJENDRA JASPAL, ABHA DHULIA, ANJALI PAIGANKAR AND THE PEOPLE OF SANGANVA
Director: SHYAM BENEGAL Produced by: SHYAM BENEGAL/SAHYADRI FILMS FOR GUJARAT CO-OPERATIVE MILK MARKETING FEDERATION LTD. Story Idea: V. KURIEN AND SHYAM BENEGAL Screenplay: VIJAY TENDULKAR Dialogue: KAIFI AZMI
Cinematographer: GOVIND NIHALANI Editing: BHANUDAS DIWAKAR Sound: HITENDRA GHOSH Music: VANRAJ BHATIA
Art Director: SHAMA ZAIDI Production Control: G. B. GHANEKAR

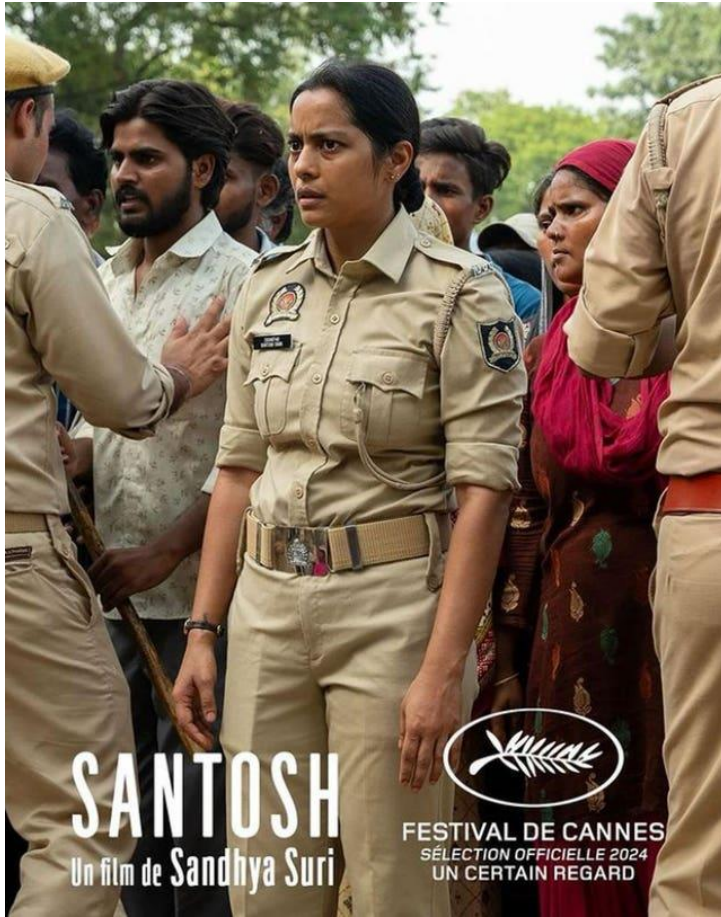
কান ক্লাসিকে দ্যাখানো হবে শ্যাম বেনেগালের মন্থন। ছবিটি ক্রাউড ফান্ডে তৈরী একটি নজির নির্মান।

কালকূট ১০০, রঙ্গন



২০২১ সালে পায়াল কপাড়িয়া গুঁর আ নাইট অফ নোইং নাথিং এর জন্য পেয়েছিলেন কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকেই সেরা তথ্যচিত্রের সম্মান। এই বছর গুঁর ফিচার ফিল্ম পাম দ'রের জন্য মনোনীত হয়েছে। যদি সেরা ছবির পুরস্কার পায় তাহলে নীচা নগরের পর আবার ভারতের ঝুলিতে আসবে সোনার পালক এবং কানে ভারতের গৌরবে নীচা নগর, পথের পাঁচালী বা সালাম বন্ধের সাথে উচ্চারিত হবে এই ছবি!

কালকূট ১০০, রঙ্গন



সন্ধ্যা সুরির 'সন্তোষ' দ্যাখানো হবে আন সার্টেন রিগার্ড বিভাগে (উপরের ছবিটি)।

পুনে ফিল্ম ইন্সটিটিউটের সানল্লাওয়ারস ওয়েয়ার দ্য ফার্স্ট ওয়াল্ফ টু নো ছবিটি লা সিনে বিভাগে মনোনীত হয়েছে।

লাইমলাইট

ORDER YOUR E-BOOK



14/-

Book your e-copy on this number
94323 18124



BRIFEESY GROUP

আগামী ২২ মে প্রকাশিত হতে চলেছে ব্রাইফেসি গ্রুপের প্রথম ইলেকট্রনিক বই
'নেমেসিস'।

কালকূট ১০০, রঙ্গন